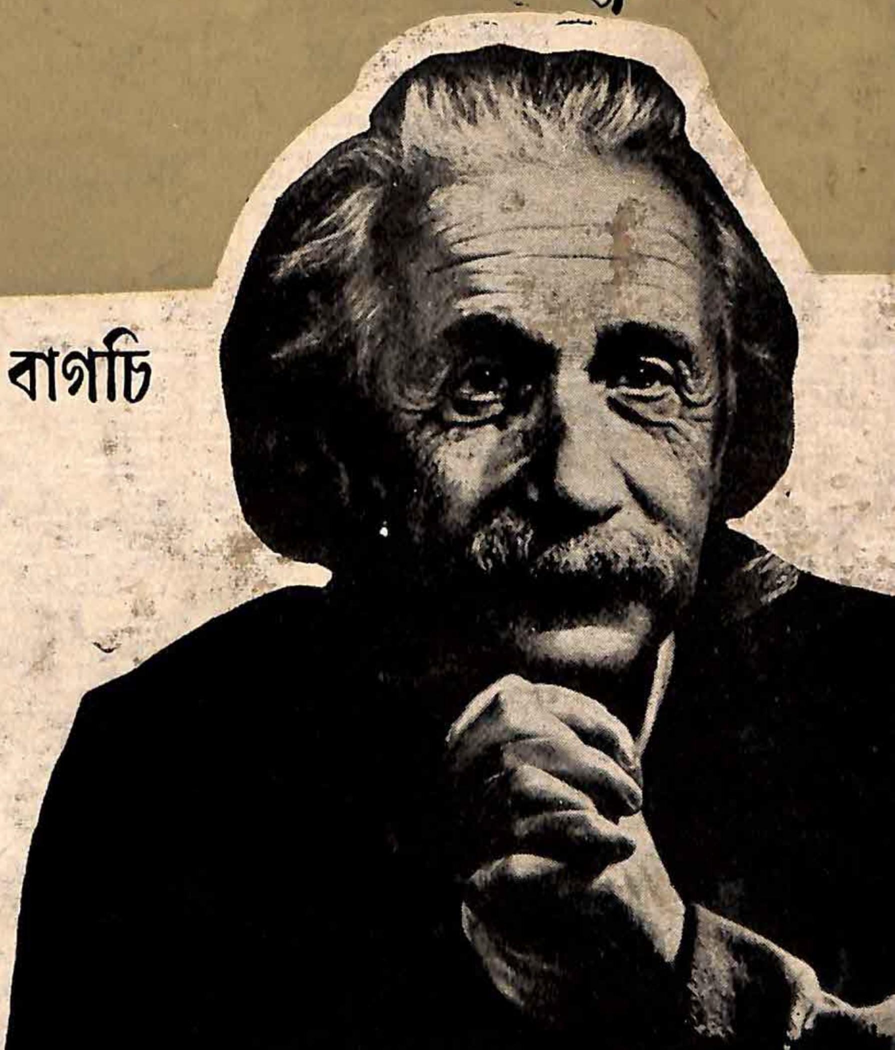
মহাবিজ্ঞানী আইনস্টাইন



মণি বাগচি



মহাবিজ্ঞানী আইনস্টাইন

মণি বাগচি

দিবাকর সেন
কর্তৃক সংশোধিত ও পরিবর্ধিত

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ
৮৬/১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৯

প্রকাশক :
রবীন বল
৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা-৭০০০৯

মূল্য : ১৫ টাকা

Acc No – 16668

প্রথম প্রকাশ : ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৫
দ্বিতীয় প্রকাশ : রথযাত্রা, ১৩৮৬
তৃতীয় প্রকাশ : দীপাবলী, ১৩৯৩
চতুর্থ মুদ্রণ : ১৯৮৯

প্রচ্ছদ : রঞ্জিত দাস

মুদ্রাকর :
অসিত সরকার
তাপসী প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৬, শিবু বিশ্বাস লেন
কলিকাতা-৭০০০০৬

মণি বাগচি প্রণীত
জীবনী সাহিত্য

শরৎচন্দ্র
রাজা রামমোহন
যুগদেবতা রামকৃষ্ণ
পরমাপ্রকৃতি সারদাদেবী
বীর-সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ
আলোকময়ী শ্রীমা
পরমাণু-বিজ্ঞানী ডঃ ভাবা
বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ
বিজ্ঞানসাধক জগদীশচন্দ্র
জীবনীশতক

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

আইনস্টাইন। বিজ্ঞানজগতের নবীন কলম্বাস।

এই নামটি উচ্চারণ করলেই মনের মধ্যে জেগে ওঠে এমন একটি আশ্চর্য মানুষের মূর্তি, জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যাঁর মৌলিক অবদান পৃথিবীর মানুষ আজও সম্যক উপলব্ধি করে উঠতে পারেনি। এমন একটি মানুষ যাঁর চিন্তা বর্তমানকে অতিক্রম করে এগিয়ে গিয়েছে ভবিষ্যতের সুদূরপ্রসারী পথে। এই মাটির পৃথিবীতে বসে সুদূরের নক্ষত্রদের সঙ্গে তিনি কথা বলতেন, এবং দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য ব্যতিরেকেই তাদের তিনি দেখতে পেতেন। সাধারণ বিজ্ঞানী তিনি ছিলেন না—তিনি ছিলেন একজন পরমবিজ্ঞানী। পিথাগোরাস, আর্কিমিডিস, কোপানিকাস, গ্যালিলিও এবং নিউটন—বিজ্ঞান-জগতের এই পঞ্চ মহারথীর মতোই আইনস্টাইনও ছিলেন বিজ্ঞানের জয়যাত্রার পথের এক নিঃসঙ্গ ও নির্ভীক পথিক। বিজ্ঞানী হিসাবে তিনি যত বড় ছিলেন, তেমনি মানুষ হিসাবেও তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব সারা বিশ্বেই স্বীকৃত।

তাঁর জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে লেখা এই বইতে বিজ্ঞানী আইন-স্টাইনের পাশাপাশি মানুষ আইনস্টাইনের স্বল্প-বিস্তর পরিচয় দেওয়া হয়েছে। এই পুস্তক রচনায় তথ্যের জন্য আমি বিশেষভাবে নির্ভর করেছি এই চারখানি জীবনচরিতের ওপর, যথা—লিওপোল্ড ইনফেলডের 'Albert Einstein'; আইলেসা ফোর্সির 'Einstein : Theoretical Physicist'; ফ্রাঙ্ক ফিলিপের 'Einstein : His Life and Times' এবং পল আর্থার শিলপের 'Albert Einstein : Philosoyher Scientist'; এছাড়া, বিজ্ঞানীর নিজের লেখা 'The World As I See It', Out of My Later Years' ও 'The Ideas and Opinions'—এই তিনটি বই থেকেও কিছু তথ্য সংগৃহীত হয়েছে।

৯০ বাগুইহাটি রোড
কলিকাতা-৭০০০২৮
জুলাই, ১৯৭৮

মণি বাগচি

নতুন সংস্করণের ভূমিকা

বিশ্ববিজ্ঞানে আইনস্টাইন একটি আশ্চর্য নাম। যে কোন বয়সের মানুষকে এই নামটি আকর্ষণ করে। তাঁর কর্মকৃতি ও জীবন সম্পর্কে জানবার কৌতূহল স্বাভাবিক কারণেই অনস্বীকার্য। তাই জাতীয় জীবনীকার মণি বাগচী কিশোরদের উপযোগী এই গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন কিশোর ছাত্রছাত্রীদের কথা মনে রেখেই। যাতে মহাবিজ্ঞানী আইনস্টাইনের জীবন ও কর্ম ছাত্রছাত্রীদের অনুপ্রাণিত করে। ইতিমধ্যে গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ নিঃশেষিত। গ্রন্থটি পাঠক সমাজে বিশেষ করে ছাত্র সমাজে যথেষ্ট সমাদর লাভ করেছে। সেই দিকে লক্ষ্য রেখেই বর্তমান গ্রন্থটির তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশকালে পুনরায় সংশোধিত ও পরিবর্তিত আকারে প্রকাশ করা হল।

গ্রন্থটিতে বেশ কিছু নতুন তথ্য সংযোজিত হয়েছে। ক্ষেত্রবিশেষে রচনার কাঠামো অপরিবর্তিত রেখে রচনার সামান্য অদলবদল করা হয়েছে। তাছাড়া গ্রন্থটিতে বেশকিছু দুষ্প্রাপ্য আলোকচিত্র যুক্ত করা হয়েছে।

দিবাকর সেন

তত্ত্বাবধায়ক : জগদীশচন্দ্র বসু যন্ত্রাগার

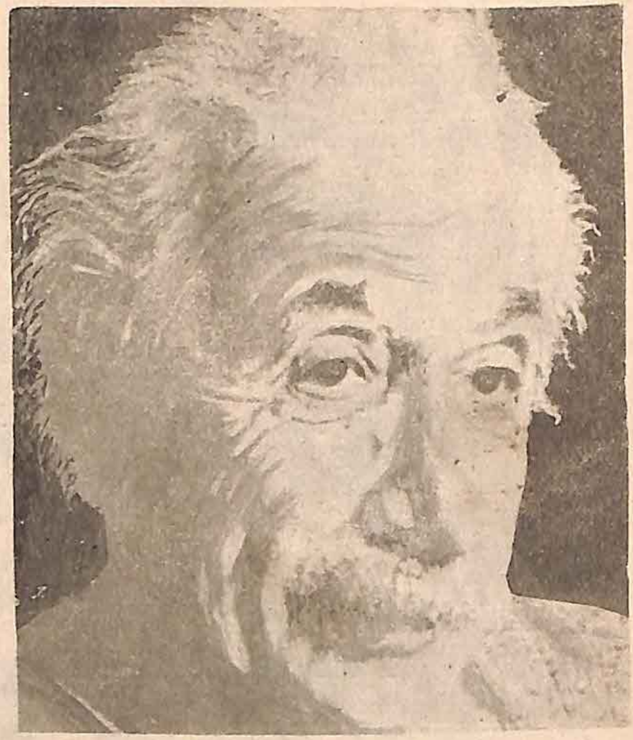
বসু বিজ্ঞান মন্দির

৯৩/১ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রোড কলকাতা-৯



যৌবনে আইনস্টাইন

প্রিস্টন গবেষণা
গৃহে
আইনস্টাইন



প্রথম পত্নী মিলেভার সঙ্গে আইনস্টাইন 1911



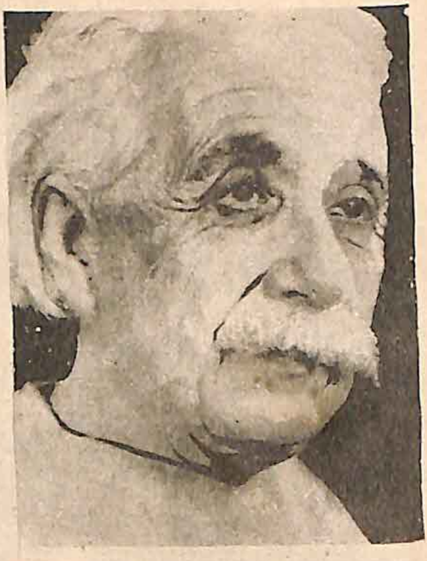


1920 সালে তোলা বিজ্ঞানীর
দুষ্প্রাপ্য ফটোগ্রাফ্



উলম্ শহরে 20 বার্থহফ্‌স্ট্রাসের এই বাড়িতে
আইনস্টাইন জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

পরিণত বয়সে চিন্তামগ্ন
আইনস্টাইন



ভগ্নী মায়ার সঙ্গে আইনস্টাইন 1885



॥ এক ॥

১৯৩৯। অক্টোবর মাস।

য়ুরোপে তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়েছে।

রুজভেল্ট—ফ্র্যাঙ্কলিন ডেলানো রুজভেল্ট—তখন মার্কিন যুক্ত-রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট। জন্মভূমি জার্মান থেকে নির্বাসিত হয়ে, বিশ্ববিখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইন তখন এই দেশে আশ্রয় নিয়েছেন। এখানকার প্রিন্সটন ইনস্টিট্যুট ফর অ্যাডভান্সড স্টাডির তিনি তখন একজন সম্মানিত অধ্যাপক। এই সময়ে তিনি কয়েকজন সতীর্থের অনুরোধে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টকে একটি গুরুত্বপূর্ণ চিঠিতে লিখেছিলেন—

'প্রিয় মিস্টার প্রেসিডেন্ট, সম্প্রতি আমি ইতালির বিখ্যাত পদার্থবিদ্ ফের্মির একটি গবেষণা-পত্রের পাণ্ডুলিপি পাঠ করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, অদূর ভবিষ্যতে ইউরেনিয়ামকে শক্তির একটি নতুন এবং গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসাবে পরিণত করা যেতে পারে। যদি কোনো একটি বন্দরের ওপর এই ধরনের একটিমাত্র বোমার বিস্ফোরণ ঘটে তার ফলে সেই বন্দরটি এবং তার আশপাশ সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। আপনার সরকারের উচিত হিটলারের বিশ্বগ্রাসী অভিযানকে প্রতিহত করবার জন্য অবিলম্বে পরমাণু-বিজ্ঞানের গবেষণায় মনোযোগী হওয়া। বিশ্বের সেরা পরমাণু বিজ্ঞানীদের সমাবেশ এখন আপনার রাষ্ট্রে ঘটেছে—তাঁদের সহায়তা

আপনি অনায়াসেই লাভ করতে পারেন—নতুবা এই যুদ্ধের অনিবার্য পরিণতি হবে মানবসভ্যতার ধ্বংস। ইতি,

আপনার বিশ্বস্ত বন্ধু
আলবার্ট আইনস্টাইন।'[১]

ছয় বছর পরের কথা।

১৯৪৫। ৬ আগস্ট।

আধুনিক পৃথিবীর ইতিহাসে এটি একটি অবিস্মরণীয় তারিখ। আমেরিকার প্রেসিডেন্টের পদে তখন অধিষ্ঠিত ছিলেন ট্রুম্যান। ঐ তারিখে তাঁর নির্দেশে মার্কিন সামরিক বিমানবহর থেকে জাপানী শহর হিরোশিমার ওপর একটি অ্যাটম বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। পৃথিবীতে সেই প্রথম অ্যাটম বোমার আবির্ভাব ঘটল। সমসাময়িক বিবরণ থেকে জানা যায় যে, এই বোমার বিস্ফোরণের ফলে আশী হাজার লোক নিহত হয়; আহত হয় এক লক্ষ আর গৃহহারা হয় দুই লক্ষেরও কিছু অধিক। মোট কথা, গোটা শহরটিই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে গিয়েছিল। এই ঘটনার ঠিক তিন দিন পরে, ৯ আগস্ট আর একটি জাপানী শহর নাগাসাকির ওপর ঐ রকম একটি বোমা ফেলা হয়েছিল এবং সেখানেও ঐরকম ধ্বংসলীলা ঘটে গিয়েছিল। অনন্যোপায় হয়ে জাপান আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হলো। সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটল।

যে পরমাণু বোমার বিস্ফোরণের ফলে এটা সম্ভব হয়েছিল তার উৎস ছিল একটি মৌলিক বৈজ্ঞানিক তথ্য যেটি ছাব্বিশ বছর বয়স্ক এক তরুণ পদার্থবিদের মস্তিষ্কে জন্ম নিয়েছিল। তিনি একজন জার্মান ইহুদী। নাম তার—আলবার্ট আইনস্টাইন। এত কম বয়সে এমন একটি মৌলিক তথ্য এর আগে পৃথিবীতে আর কোনো বিজ্ঞানী আবিষ্কার করতে পারেননি। এই শতাব্দীর সূচনাকালে

---

১. সম্পূর্ণ চিঠিখানি পরিশিষ্ট (খ-তে দ্রষ্টব্য।

বিজ্ঞান জগতে এই অখ্যাত তরুণ বিজ্ঞানী যখন তাঁর নবীন প্রতিভা নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন তখন থেকে আমাদের দৃষ্টিপথ থেকে চিরদিনের মতো অন্তর্হিত হয়ে যায় নিউটনের জগৎ ; সেইখানে দেখা দিল এক নতুন পৃথিবী—আইনস্টাইনের পৃথিবী। পৃথিবীতে বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার একটা যুগ শেষ হয়ে শুরু হয় আর একটা নতুন যুগের। মহাকর্ষকে পিছনে ফেলে আমরা উপনীত হলাম পরমাণুর যুগে। আইনস্টাইনের উদ্ভাবিত অপেক্ষাবাদ বা Theory of Relativity এই যুগকে ত্বরান্বিত করে দিয়েছে। এই মহাবিজ্ঞানীর জীবনকথাই আমরা আলোচনা করছি।

দক্ষিণ জার্মানির দানিয়ুব নদীর পশ্চিম পাড়ে উলম শহর।

এই শহরেই ১৮৭৯ সালের ১৪ মার্চ জন্মগ্রহণ করেন আলবার্ট আইনস্টাইন। ছোট্ট শহর ; এটি জার্মানির ব্যাভেরিয়া অঞ্চলের অন্তর্গত। আইনস্টাইন পরিবার বেশ সংগতি-সম্পন্ন ছিল। 'আমার শৈশব-স্মৃতি বলতে কিছুই মনে পড়ে না।' একথা তিনি নিজেই বলেছেন। উলম শহরে তাঁর বাবা হেরমান আইনস্টাইনের একটি কারখানা ছিল—ইলেক্‌ট্রো-টেকনিক্যাল ওয়ার্কস। তিনি ইঞ্জিনীয়ার ছিলেন। হেরমান ও তাঁর ভাই জ্যাকব দু'জনে মিলে এটি চালাতেন। আলবার্টের বয়স যখন মাত্র এক বছর তখন হেরমানের দোকান উঠে যায়। তিনি দেউলিয়া হয়ে পড়েন। বাধ্য হয়ে হেরমান ভাগ্যের সন্ধানে মুনিখে চলে যান। সেখানে তিনি ডায়নামো, আর্কল্যাম্প ও নানারকমের মাপজোকের যন্ত্রপাতি তৈরি করে বিক্রি করা শুরু করেন। এতে হেরমান লাভবান হতে থাকেন। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি মুনিখের উপকণ্ঠে সেণ্ডলিঙে একটি বাগানবাড়ি কেনেন। এই বাড়িতেই ১৮৮১ সালে আলবার্টের বোন মেয়ার জন্ম হয়। শৈশবে দুই ভাইবোনের মধ্যে খুব ভাব ছিল। বাড়ির বাগানে দু'জনে একত্রে খেলা করতেন। শৈশবে তিন বছর বয়স পর্যন্ত আলবার্ট

কথা বলতে শেখেননি। নয় দশ বছর বয়সেও তিনি কিছুটা থেমে থেমে কথা বলতেন। এতে পরিবারের লোকেরা যথেষ্ট চিন্তাগ্রস্ত হয়েছিলেন। তারা ভেবেছিলেন হয়ত আলবার্ট বড় হয়ে জড়বুদ্ধি সম্পন্ন হবে। তাছাড়া আলবার্ট ছিলেন খুব শান্তশিষ্ট লাজুক। অন্যান্য সমবয়সীদের থেকে আলাদা। খেলাধুলো, দৌড়ঝাঁপ তিনি বিশেষ পছন্দ করতেন না। ছেলেবেলায় অনেক সময় বাড়ির সামনের রাস্তা দিয়ে সৈন্যরা কুচকাওয়াজ করে বাজনা বাজিয়ে শোভাযাত্রা করে যেত। অন্য ছেলেরা এ দৃশ্য দেখার জন্য রাস্তার ধারে জমায়েত হতো। কোন ছেলেই বাদ যেত না। এর ব্যতিক্রম ছিলেন আলবার্ট। পরবর্তীকালে এ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন, সৈন্যদের কাজ হুকুমে যুদ্ধ করা। আর হুকুম তালিম করতে গিয়ে যুদ্ধে সাহসিকতা প্রমাণ করা। দেশপ্রেমের নামে যুদ্ধ করাকে আমি ঘৃণা করি। ছোট্ট সংসার ; ছুটি ছেলেমেয়ে—আলবার্ট ও মেয়া। আলবার্টের মা পলিন কক আইনস্টাইনের নিপুণ তত্ত্বাবধানে সেই সংসারে শান্তি ছিল। পলিন খুব ভালো গান-বাজনা জানতেন ; ছেলেকে তিনি ছ'বছর বয়স থেকেই বেহালা বাজানো শিখিয়েছিলেন! উত্তরকালে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বেহালা বাদকদের মধ্যে বিজ্ঞানী আইনস্টাইন অন্যতম বলে গণ্য হয়েছিলেন। বেহালা ছিল তাঁর চিরজীবনের সঙ্গী।

আইনস্টাইন পরিবার জাতিতে জার্মান-ইহুদী ছিলেন। আলবার্টের বয়স যখন পাঁচ বছর তখন তাঁর বাবা সপরিবারে মিলানে চলে আসেন এবং সেইখানেই বসবাস করতে থাকেন। কারখানাটিও মিলানে নিয়ে আসা হয়। পলিন নতুন করে সংসার পাতলেন এখানে। পরিবারের সকলের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধান ছিল তাঁর প্রধান কাজ, কিন্তু সেজন্য পিয়ানো বাজানো বাদ যেত না একদিনও। পুত্রকে পাশে বসিয়ে তিনি পিয়ানো বাজাতেন—আলবার্ট তন্ময় হয়ে মায়ের বাজানো শুনতেন। পলিন ছিলেন

বীটোফেনের অনুরাগিনী—পিয়ানোর বুক থেকে বীটোফেনের সুরলহরী যখন উঠতো তখন মুগ্ধ বালক তাঁর সমস্ত হৃদয় মন দিয়ে তা শুনতেন। কী এক অপার্থিব আনন্দে তাঁর সমস্ত সত্তা ভরে উঠতো। এই সংগীতপ্রবণতা বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের প্রতিভার একটি বিশিষ্ট দিক। তিনি কিন্তু মোজার্টের অনুরাগী ছিলেন।

জাতিতে ইহুদী হলেও আইনস্টাইন পরিবারের কেউ ঐ ধর্মের কোনো আচার-অনুষ্ঠান তেমন মানতেন না। মিলানে তাঁরা যেখানে থাকতেন সেখান থেকে ইহুদী ছেলেমেয়েদের জন্য স্কুলটা ছিল বেশ খানিকটা দূরে। সেইজন্য ছয় বছর বয়স হলে আলবার্টকে ক্যাথলিক খ্রীস্টানদের একটা স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হয়। ঐ স্কুলটা তাঁদের বাড়ির কাছেই ছিল। আসলে সেটা ছিল একটা পাঠশালা। পাঠশালার পড়া শেষ হলে দশ বছর বয়সে তাঁকে একটি স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হলো। লুইটপোল্ড জিমনাসিয়াম ছিল একটি উচ্চ বিদ্যালয়, এখানকার নিয়মকানুন ছিল খুব কঠোর। এখানে লাতিন ও গ্রীক পড়ানো হতো ; কিন্তু আলবার্টের বিশেষ আগ্রহ ছিল না ঐ দুটি ভাষা শেখবার জন্য। ইতিহাসটা তাঁর কাছে খুবই নীরস মনে হতো : ইতিহাসের সন-তারিখ কিছুতেই তিনি মনে রাখতে পারতেন না। স্কুলে ছেলে কি রকম পড়াশুনো করছে। ভবিষ্যতে কী নিয়ে পড়াশুনো ছেলের পক্ষে উপযোগী হবে—এই প্রশ্ন নিয়ে একদিন আলবার্টের পিতা গিয়েছিলেন স্কুলের প্রধান শিক্ষকের কাছে। উত্তরে প্রধানশিক্ষক বলেছিলেন, এ ছেলেকে যে কোন বিষয়েই পড়াতে পারেন। তবে কোন বিষয়েই সুবিধে করতে পারবে না। বেয়াড়া অমনোযোগী ছেলে।

তাঁর অনুসন্ধিৎসা প্রবৃত্তি ছিল অসাধারণ। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে কিশোরের মনে সব সময় অদ্ভুত ধরনের প্রশ্ন জাগত আর শিক্ষকদের কাছ থেকে তিনি সেইসব প্রশ্নের উত্তর প্রার্থনা করতেন। কেমন করে এই পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছে আর কেনই বা সৃষ্টি হয়েছে—

এইসব প্রশ্ন শুনে শিক্ষকগণ রীতিমত ব্যতিব্যস্ত হতেন। তাঁরা নিজেরাই এসব প্রশ্ন বুঝতেন না ; তাই এর কী উত্তর দেবেন তাঁরা জানতেন না। এতকাল এখানে মাস্টারি করছেন, কখনো কোনো ছাত্রের কাছ থেকে তাঁরা এমন সব অদ্ভুত প্রশ্ন শোনেন নি। কিন্তু এসব প্রশ্নের জবাব তিনি পেতেন বাড়িতে তাঁর বাবার কাছে, কাকা জ্যাকবের কাছে আর ম্যাক্স ট্যালমে নামক একটি রুশীয়-ইহুদী ছেলের কাছ থেকে। ইনি ডাক্তারি পড়তেন আর প্রতি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় তাঁদের গৃহে নৈশভোজে আমন্ত্রিত হয়ে যোগদান করতে আসতেন। ম্যাক্সকে আলবার্ট 'দাদা' বলে ডাকতেন। 'আপনার আলবার্ট একটি ক্ষণজন্মা ; কী প্রকাণ্ড এর মাথা ! বড়ো হয়ে ও একজন অসাধারণ মানুষ হবে।' এই কথা একদিন ডিনার টেবিলে ম্যাক্স বলেছিলেন পলিন এবং তাঁর স্বামী হেরমান আইনস্টাইনকে।

এই ভবিষ্যদ্বাণী নিষ্ফল হয়নি।

সমস্ত পৃথিবীর মানুষ, পৃথিবীর সমস্ত বিজ্ঞানী সমাজ দেখেছে কী আশ্চর্য ভাবেই না সফল হয়েছিল এই ভবিষ্যদ্বাণীটি।

তাঁর ম্যাক্স দাদার কাছ থেকে কিশোর আলবার্ট একটি বই পেয়েছিলেন। বইটির নাম 'Force and Matter' ; লুডউইগ বুশনারের লেখা একটি বই পড়ার পর আলবার্টের মনের মধ্যে একটা অদ্ভুত ধারণা জেগে উঠল ; বাড়ি থেকে স্কুল আর স্কুল থেকে বাড়ি, এই যে প্রাত্যহিক জীবন এর চেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হলো নক্ষত্র, মহাকর্ষ আর চুম্বকের জগৎ। প্রতিদিন তাঁর মনের মধ্যে জাগত একটি বিচিত্র প্রশ্ন—'কী ঘটতে পারে যদি কোনো একজন মানুষ একটি ঘরের মধ্যে একটি আলোক-রশ্মিকে বন্দী করে রাখে ?' বারো বছর বয়সে ইউক্লিডের জ্যামিতির সঙ্গে আলবার্টের পরিচয় ঘটেছিল। জ্যামিতির প্রত্যেকটি সমস্যা (Problem) সমাধান করার পর তিনি আরো কঠিন সমস্যার সমাধানের জন্য উৎসাহ বোধ করতেন। তাঁর ম্যাক্স দাদার

সহায়তায় আলবার্ট ক্লাসের ছাত্রদের পেছনে ফেলে এগিয়ে গিয়েছিলেন এবং ক্লাসের 'ফার্স্ট' বয় বলে গণ্য হয়েছিলেন। স্কুলে কিন্তু ছুটি বিষয়ে তিনি কিছুমাত্র আগ্রহ বোধ করতেন না—সে ছুটি লাতিন ও গ্রীক ভাষা।

বাড়িতে তাঁর বাবা, মা ও কাকা সবাই লক্ষ্য করতেন যে একমাত্র অঙ্কশাস্ত্রের প্রতি আলবার্টের ঝোঁক ছিল। আর ঝোঁক ছিল পিয়ানো ও বেহালার ওপর। এই ছুটি ছিল তাঁর চিত্ত-বিনোদনের সহায়ক। ছ'বছর বয়স থেকেই তিনি তাঁর মায়ের কাছে বেহালা বাজাতে শিখেছিলেন। মোজার্ট ছিলেন তাঁর প্রিয় সুরকার। পিয়ানোতে বসে তিনি খুব যত্নের সঙ্গে, অধ্যবসায়ের সঙ্গে অভ্যাস করতেন। উত্তরকালে আইনস্টাইন বলতেন—'ঈশ্বরের সৃষ্টির তুল্যই মোজার্টের সুরসৃষ্টি।'

১৮৯৪।

আলবার্টের বয়স তখন পনর বছর। সংসারে ছুর্দিন ঘনিয়ে এলো। ব্যবসায়ে ভীষণ মন্দা দেখা দিল, একটির পর একটি কঠিন অবস্থা আসতে থাকে এবং অবশেষে সংসারের আর্থিক সংকট চরমে উঠল। আলবার্টের মা ছিলেন একজন প্রকৃত সুগৃহিণী। এতবড় ছুর্দিনে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে শক্ত হাতেই পলিন তখন সংসারের হাল ধরলেন। খাওয়া দাওয়া সরল ও সংক্ষিপ্ত করা হলো। সংসারের অন্যান্য খরচপত্র সব কমিয়ে দিলেন। এই সময়ে ম্যাক্স ট্যালমে ডাক্তারি পড়া শেষ করে নিউ ইয়র্কে চলে গিয়েছে সেখানে চিকিৎসা ব্যবসায় শুরু করার জন্য। চিঠিপত্রের মাধ্যমে আলবার্ট তাঁর ম্যাক্স দাদার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করেছিলেন। তাঁদের এই সাংসারিক বিপর্যয়ের দিনে একমাত্র তাঁর কাছ থেকেই আলবার্ট আশা ও উৎসাহের কথা শুনতে পেতেন।

আইনস্টাইন পরিবার তখন মিলান থেকে ইতালিতে চলে

এলেন। এইখানে তাঁদের পরিবারের একটি শাখার বসবাস ছিল। তাঁরা বেশ সংগতি সম্পন্ন ছিলেন। এঁদেরই এক সমবয়সী ছেলের কাছে ইতালির দ্রাক্ষাকুঞ্জ, সুন্দর সূর্যালোক, বন্দর জাহাজ—এইসব বর্ণনা শুনে অবধি ইতালির প্রতি আলবার্টের মনের মধ্যে একটা অদম্য কৌতূহল নিশ্চয়ই জেগে থাকবে। ইতালি যাওয়ার জন্য তিনি মনে মনে অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু তাঁর সমস্ত উৎসাহ যেন নিভে গিয়েছিল যেদিন তাঁর বাবার কাছে জানতে পারলেন যে, বাড়ির সবাই ইতালি যাচ্ছে, কিন্তু তাঁর যাওয়া হবে না।

—আমি ঠিক করেছি আমার এক পুরাতন বন্ধুর কাছে এখানেই থেকে তুমি লেখাপড়া করবে।

—কিন্তু বাবা, আমি—

—সকলের খরচ চালানো এখন আমার পক্ষে অসাধ্য। তোমার পক্ষে এখানে থেকে জিমনাসিয়ামে লেখাপড়া করাই ভালো হবে।

ছেলের পিঠে হাত রেখে সস্নেহে এই কথা বললেন তিনি। আলবার্ট সঙ্গে যাবে না, এজন্য মায়ের মনে দুঃখ বড় কম ছিল না। কিন্তু ভাগ্যের বিধানকে তিনি মেনে নিলেন। সবাই যখন ইতালি চলে গেল তখন আলবার্ট যারপর নাই নিঃসঙ্গ বোধ করছিলেন। সেই নিঃসঙ্গতা তিনি লেখাপড়ার মধ্যে তন্ময় হয়ে ভুলে যেতেন। ইতালি থেকে ছোট বোন মেয়ার প্রথম চিঠিখানা তিনি যেদিন পেলেন সেদিন তাঁর কি আনন্দই না হয়েছিল। 'দাদা তোমার জন্য আমার মন বড্ড কেমন করে; আমার সব সময় তোমার কথা মনে পড়ে। তুমি কিন্তু মন দিয়ে লেখাপড়া করো।' ছোট বোনের এই চিঠিখানা তার দাদার মনে কি রকম আনন্দের সঞ্চার করেছিল, সেটা আমরা সহজেই কল্পনা করতে পারি।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ভবিষ্যতে যিনি আপেক্ষিকতত্ত্ব আবিষ্কার করে বিজ্ঞানে যুগান্তর নিয়ে আসবেন, সেই আইনস্টাইন কিন্তু স্কুলে বিশেষ কোনো মেধার পরিচয় দিতে পারেন নি; শিক্ষকরাও এই ছাত্রটির

মধ্যে প্রতিভার তেমন কিছু লক্ষণ দেখতে পাননি। সাধারণ ভাবে পাঠ্য বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে আইনস্টাইনের কোনো কৌতূহল ছিল না। ব্যতিক্রম দুটি বিষয়—গণিত ও পদার্থবিদ্যা। জ্যামিতিতে একটি উপপাদ্য তাঁকে অবাক করেছিল। একটি ত্রিভুজের তিনটি শীর্ষবিন্দু থেকে যখন বিপরীত বাহুগুলির উপরে তিনটি লম্ব টানা হয়, তখন সেই তিনটি লম্ব একটি বিন্দুতে মিলিত হয়। 'এই মিলিত হওয়ার ব্যাপারে আমি খুব অবাক হয়েছিলাম।' উত্তরকালে জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর ছাত্রদের এক ঘরোয়া বৈঠকে এই কথা বিজ্ঞানী বলেছিলেন। প্রতিভা চিরকালই দুর্জ্ঞেয় ও রহস্যময়। কার মধ্যে কি রকম ধরনের প্রতিভা সুপ্ত থাকে তা সচরাচর আমরা বুঝে উঠতে পারি না। বুঝে উঠতে পারি না কখন সেই প্রতিভার স্ফূরণ ঘটবে। ষোল বছর বয়স পর্যন্ত আইনস্টাইনের মধ্যে প্রতিভার কোনো লক্ষণ দেখা যায়নি।

॥ দুই ॥

জিমনাসিয়ামে কিন্তু তাঁর বেশিদিন পড়া হলো না। কারণ এখানকার শিক্ষাপদ্ধতি আলবার্টকে ক্লান্ত করে তুলেছিল। নিয়মমাফিক পড়াশুনোর চাপে আলবার্ট ঠিক করলেন তিনি আর এখানে পড়বেন না। পড়বেন না বললেই তো স্কুল ছাড়া যায় না। তিনি দেখা করলেন তাঁর পরিচিত এক ডাক্তারের কাছে। তাঁর কাছে তিনি সব খুলে বললেন। সহৃদয় ডাক্তারটি আলবার্টকে একটি অসুস্থতার সার্টিফিকেট দিলেন। তাতে তিনি লিখলেন আলবার্ট স্নায়ুবৈকল্য রোগের স্বীকার হয়েছে। এ রোগ এখানে থাকলে সারবে না। আলবার্টকে মা বাবার কাছে গিয়ে থাকতে হবে। এই সার্টিফিকেটের জোরে আলবার্ট স্কুল থেকে ছাড়া পেলেন। যাওয়ার আগে তিনি দেখা করলেন স্কুলের গণিতের শিক্ষকের সঙ্গে। তিনি আলবার্টের সার্টিফিকেটে লিখলেন আলবার্ট গণিতে দক্ষ ও প্রতিভাসম্পন্ন। স্কুল পাশের সার্টিফিকেট না থাকলেও আলবার্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার উপযোগী।

আলবার্ট জুরিখে হাজির হলেন। কিন্তু পলিটেকনিক স্কুলে ভর্তি সহজসাধ্য হলো না। কারণ তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হয়ে ভর্তি হতে এসেছেন। অনেক চেষ্টায় নির্বাচনী পরীক্ষা দিতে তিনি সক্ষম হলেন। গণিতে তিনি খুব ভাল নম্বর পেলেন। পলিটেকনিক স্কুলের অধ্যক্ষ আলবার্টকে ডেকে পাঠালেন। বললেন

সুইজারল্যাণ্ডের কোন স্কুল থেকে স্কুল পাশের ডিপ্লোমা নিতে। বাধ্য হয়ে আলবার্ট ভর্তি হলেন আরাউ-এর একটি স্কুলে। ঐ স্কুলটি তাঁর ভাল লাগল। পাশ করে তিনি ফিরে এলেন জুরিখে। আবেদন করলেন পলিটেকনিকে। এবার বিনা নির্বাচনী পরীক্ষাতেই তিনি ভর্তি হলেন পলিটেকনিকে। এবার কিন্তু আলবার্ট ঠিক করলেন তাঁকে পড়তে হবে পদার্থবিদ্যা নিয়ে। অঙ্ক নিয়ে নয়। এখান থেকে কোনো ডিপ্লোমা না নিয়েই ইতালিতে চলে এলেন আলবার্ট। এ সময়ে তিনি জার্মান নাগরিকত্ব ত্যাগ করেন। তখন আজকালকার মত নাগরিকত্ব নিয়ে এত কড়াকড়ি ছিল না। এ সময়ে তিনি বছর কয়েক কোন দেশেরই নাগরিক ছিলেন না। ইতালিতে এসে আলবার্ট মুক্তির স্বাদ পেলেন। ঘুরে ঘুরে দেখেন শহরের নানা দর্শনীয় স্থান। কখনো যান পুরোনো স্থাপত্য দেখতে কখনো প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী দেখতে। আলবার্টের হঠাৎ এভাবে আগমনে বাবা কিন্তু খুশি হলেন না। 'আমাদের এখনকার অবস্থা আরো সঙ্গীন। মিউনিক বা মিলানের চেয়েও খারাপ দিন যাচ্ছে এখানে। তুমি জুরিখে গিয়ে সেখানকার পলিটেকনিকে ভর্তি হও। আমি চাই তুমি ইঞ্জিনীয়ার হও।

—ইঞ্জিনীয়ারিং পড়তে আমার একটুও ইচ্ছে নেই, বাবা।

—তবে কি পড়তে চাও ?

—জুরিখের পলিটেকনিকে ভর্তি হব ঠিক করেছি।

খুব ছেলেবেলা থেকেই আইনস্টাইনের মনে অনুসন্ধিৎসার ভাবটা প্রবল ছিল। এই অনুসন্ধিৎসাই ছিল এই বিজ্ঞানীর প্রতিভার উৎস। এই সম্পর্কে তাঁর ছেলেবেলার একটা ঘটনা এখানে উল্লেখ করছি। তখন তাঁর বয়স মাত্র চার বছর সেই সময়ে তাঁদের এক আত্মীয় আইনস্টাইনের জন্মদিনে তাঁকে একটি দিক-নির্ধারক কম্পাস উপহার দিয়েছিলেন। কাঁটাটির একটি বিশেষ দিক সর্বদা একই অভিমুখে থাকার ব্যাপারটা বালকের মনে জাগিয়ে

তুলেছিল কৌতূহল। বাবাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কম্পাসের একটা কাঁটা এইভাবে থাকে কেন?' বাবা তার উত্তরে ছেলেকে বললেন 'এই রকম অভিমুখীন হয়ে থাকাটাই এর ক্ষমতা।' ভারি আশ্চর্য বোধ হয়েছিল এটা বালকের কাছে। উত্তরকালে এই ঘটনাটির কথা উল্লেখ করে আইনস্টাইন বলতেন—'আমার জীবনকে এই ঘটনাটি বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল; সারাজীবন আমি এটির কথা ভুলতে পারিনি। একটু বয়স হলে পরে আমি বুঝেছিলাম যে বাইরের জগতে কোথাও নিশ্চয় কোনো বিস্ময় আছে যার জন্যে কম্পাসের কাঁটাটি সর্বদা এই রকম আচরণ করে।'

জুরিখের পলিটেকনিকে তিনি যখন ছাত্র হয়ে এলেন তখন তাঁর মধ্যে এই অনুসন্ধিৎসার প্রাবল্য দেখে সহপাঠীরা অবাক হত, শিক্ষকরাও অবাক হতেন। আগেই বলেছি, অঙ্কশাস্ত্রেই তাঁর মাথাটা বেশি খেলতো। বাড়িতে ছেলেবেলায় তাঁর কাকার কাছে থেকেই আইনস্টাইন অঙ্কের প্রতি আকর্ষণ বোধ করতে শিখেছিলেন। কাকা ছিলেন ইঞ্জিনীয়ার। বীজগণিতের সাহায্যে কত সহজে গণিতের কঠিন সমস্যার সমাধান করা যায় তার হদিস তিনি ভাইপোটিকে দিতেন। একবার পরিহাসছলে কাকা তাঁকে বলেছিলেন—'জানিস বীজগণিত (Algebra) বড়ো মজার শাস্ত্র। মনে কর, আমরা শিকারে বেরিয়ে যে জন্তুটাকে কিছুতেই ধরতে পারি না তখন তার নাম দিই 'X'—এই এক্সটাকে ধরে এগুতে এগুতে আমরা অবশেষে শিকারটার নাগাল পাই। বীজগণিতে এই 'X'-টা কি রকম রহস্যময়, বড় হলে বুঝবি।' আইনস্টাইন বড়ো হয়ে সেটা ভালো রকমেই বুঝেছিলেন।

ম্যাগনেটিক কম্পাস আর ইউক্লিডের জ্যামিতি—এই দুটি জিনিসই আইনস্টাইনকে ছেলেবেলা থেকেই অনুসন্ধিৎসু করে তুলেছিল। ইউক্লিডের জ্যামিতি তাঁর মনের মধ্যে এমনভাবে দাগ কেটেছিল যে, উত্তরকালে তিনি এই সুন্দর মন্তব্যটি করেছিলেন—

'যৌবনকালে ইউক্লিডের জ্যামিতির সঙ্গে যার নিবিড় পরিচয় না ঘটেছে, তার পক্ষে একজন তাত্ত্বিক গবেষক হওয়া অসম্ভব।' কেন তিনি জ্যামিতির প্রতি এমন আকর্ষণ বোধ করতেন সেই কথাটি তিনি একবার বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সমাবর্তন সভায় এইভাবে ব্যক্ত করেছিলেন—'The study of geometry made a deep impression on my young mind. I was thrilled with the methods used—the clean cut, precise language, the Proof that must be given for each statement, the sequential logic involved in each formal proof and the opportunity to reason out the solutions to problems.'

জ্যামিতি শাস্ত্রের গুরুত্বকে আজ পর্যন্ত এমন স্বল্প কথায় পৃথিবীর আর কোনো বৈজ্ঞানিক ব্যক্ত করতে পেরেছেন বলে আমাদের জানা নেই। এই মহাবিজ্ঞানীর জীবনেতিহাস পাঠ করে আমরা জানতে পারি যে, তাঁর বিস্ময়কর প্রতিভার উৎপত্তি, বিকাশ ও পরিণতি সবটাই যেন জ্যামিতিক ছন্দেই আবর্তিত হয়েছিল। জ্যামিতির মতো সুনিশ্চিত ধ্রুব লক্ষ্যেই তিনি অগ্রসর হয়েছিলেন বিজ্ঞানের পথে। তাই তো তাঁর কাছে উদ্ঘাটিত হয়েছিল এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের রহস্য। তাইতো তিনি আপন প্রতিভাবলে বিজ্ঞান-লক্ষ্মীর অমন একজন বরপুত্র হয়ে উঠতে পেরেছিলেন।

সুইস ফিডারেল পলিটেকনিক স্কুল, জুরিখ।

সুইজারল্যাণ্ডের এক বিখ্যাত বিদ্যানিকেতনের ছাত্র হয়ে যখন এলেন আইনস্টাইন তখন তাঁর বয়স ছিল সতেরো বছর। মাথায় একরাশ কালো কোঁকড়ানো চুল, প্রতিভাব্যঞ্জক দুটি আয়ত চোখ, স্বল্পবাক্ এই ছাত্রটির প্রতি শিক্ষকগণ সহজেই আকৃষ্ট হয়েছিলেন তাঁর বুদ্ধির দীপ্তি আর বিস্ময়কর মেধা দেখে। বাবা বলেছিলেন

Acc No — 16668

ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনীয়ারিং পড়তে; পুত্র কিন্তু চেয়েছিলেন বিজ্ঞান-জগতের রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে, ব্যবসায় জগতের লাভ-লোকসানের প্রতি তাঁর কিছুমাত্র আকর্ষণ ছিল না। কথিত আছে, তরুণ আইনস্টাইনের এই রকম মানসিক প্রবণতার মূলে ছিলেন আমেরিকার বিখ্যাত চিন্তানায়ক এমার্সন। এঁরই এই কথাটি তাঁর মনে নাকি দাগ কেটে দিয়েছিল – 'If a man plants himself indomitably on his instincts, the world will come round to him.' পৃথিবীর বরেণ্য মানুষদের জীবনে দেখা গিয়েছে যে, তাঁদের অন্তরের প্রেরণাই তাঁদের জীবনের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করেছে। আইনস্টাইনের জীবনটাই ছিল একালে এর একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তাঁর প্রতিভা, তাঁর মনীষা সবই ছিল তাঁর অন্তঃপ্রেরণারই বিস্ময়কর অভিব্যক্তি।

পলিটেকনিকে ভর্তি হয়ে অবধি আইনস্টাইন দিনরাত পড়াশুনার মধ্যে ডুবে থাকতেন। এ সময় তিনি হঠাৎ চৌম্বক শক্তি সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লেখেন। লেখা শেষে তিনি তাঁর প্রবন্ধটি পাঠিয়ে দেন তাঁর মামা সেজার কক-এর কাছে। আজ অনেকে মনে করেন এই প্রবন্ধটিই আলবার্ট আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতা তত্ত্বের প্রথম পদক্ষেপ। তাঁর গণিতের অধ্যাপক ছিলেন একজন রুশদেশীয় জার্মান। নাম—হার্মান মিনকোস্কি। তখনকার দিনে তিনি একজন খ্যাতনামা গাণিতিক ছিলেন। তিনি ক্লাসে প্রথম দিনেই একটি প্রশ্ন করে নবাগত ছাত্রদের মধ্যে প্রথম সারিতে উপবিষ্ট আইন-স্টাইনের কাছ থেকে যে উত্তর পেয়েছিলেন তাতে তাঁর মনে বিস্ময়ের সীমা পরিসীমা ছিল না। এমন কঠিন প্রশ্নের উত্তর উপরের শ্রেণীর ছাত্ররা দিতে পারে কিনা সন্দেহ। In mathematics you seem to be the most original and brillient. You have a great future, my boy' সেদিন অধ্যাপকের মুখে এই কথা শুনে তরুণ আইনস্টাইন যে মনে মনে খুব উৎসাহ বোধ করেছিলেন,

এমন অনুমান আমরা সহজেই করতে পারি। এখানকার ছাত্রাবস্থায় আলবার্ট খুব পড়াশুনো করতেন। তবে তার পরিশ্রমের ধারা ছিল বহুমুখী। পাঠ্যসূচীর বাইরে তিনি বিদ্যুৎ ও চুম্বকত্ব নিয়েই বেশি পড়াশুনো করতে ভালবাসতেন।

১৯০০।

পলিটেকনিকে পড়া শেষ হলো। শেষ ডিগ্রী পরীক্ষায় তিনি প্রথম শ্রেণীর প্রথম হলেন। এই বছরেই আইনস্টাইনের পিতার মৃত্যুতে তাঁদের সংসারে নেমে আসে বিষাদের ছায়া। সংসারের দায়িত্ব নিতে হলো তাঁকে। পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেও আলবার্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন কাজ পেলেন না। অথচ তাঁর সহপাঠীরা প্রায় সবাই পাশ করার সঙ্গে সঙ্গেই চাকুরী পেলেন শিক্ষকদের সুপারিশে। তরুণ আলবার্ট কোন সুপারিশও পেলেন না। কারণ শিক্ষকদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল অল্প। পরীক্ষার নোট ইত্যাদির জন্য তিনি কখনও শিক্ষকদের দ্বারস্থ হতেন না। একটি স্কুলে শিক্ষকতার চাকরি নিলেন। বেতন সামান্য। বাবা যে কারখানাটি রেখে গিয়েছিলেন সেটির অবস্থা তখন খুবই খারাপ—একেবারে অচল অবস্থা বললেই হয়। কাকা কোনো রকমে সেটি চালাতেন বটে, কিন্তু লাভের চেয়ে লোকসানই হোত বেশি। একটা ভালো চাকরি দরকার, বুঝলেন আইনস্টাইন। তিনি সুইস নাগরিকত্ব লাভ করেছেন, এখন একটা ভালো চাকরি পেলে সংসারের দায়িত্বটা নিয়ে মা-কে নিশ্চিন্ত করতে পারেন। এই সময়ে ফাঁকে ফাঁকে তিনি মৌলিক বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখতেন। এই প্রবন্ধকে কেন্দ্র করে তিনি জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট ডিগ্রি পান। ১৯০১ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারীতে তিনি সুইস নাগরিকত্ব পান।

ঠিক এমন সময়ে একদিন—১৯০২ সালের অক্টোবর মাসে, তাঁর এক বন্ধু, মার্সেল গ্রসমান (ইনি পলিটেকনিকে আইনস্টাইনের

অন্যতম সহপাঠী ছিলেন) এলেন তাঁর কাছে। একটি ছোট্ট ঘর ভাড়া করে আইনস্টাইন সেখানে তখন থাকতেন। বন্ধুটি একটি সুখবর নিয়ে এসেছিলেন—চাকরির খবর। সুইজারল্যাণ্ডের রাজধানী বার্ন শহরে ফেডারেল পেটেণ্ট অফিসে একটি চাকরি খালি হয়েছে, উৎসাহভরে জানালেন বন্ধু। 'কিন্তু দুর্ভাগাক্রমে তোমার পদার্থবিদ্যার সঙ্গে এই চাকরির বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই।'

—তবে কি ধরনের কাজ এটা ?

—পেটেণ্ট আফিসের বিষয়টা বোধ হয় তোমার জানা নেই। কেউ যদি কোনো কিছু উদ্ভাবন বা আবিষ্কার করে সেটা অন্য কেউ যাতে নকল করতে না পারে সেজন্য পেটেণ্ট নিতে হয়। এজন্য যেসব দরখাস্ত পেটেণ্ট অফিসে আসে সেগুলি পরীক্ষা করে দেখতে হয় যে, পেটেণ্ট পাওয়া যোগ্য কিনা। তোমাকে ঐসব দরখাস্ত পরীক্ষা করে অভিমত দিতে হবে। তবে এর দ্বারা তোমার গ্রাসাচ্ছদন ভাল ভাবেই চলবে।

—গ্রাসাচ্ছদনটা চলে এমন একটা কাজই তো খুঁজছি আমি।

—আমার বাবার সঙ্গে পেটেণ্ট অফিসের ডাইরেক্টরের আলাপ আছে। বাবাকে বলব তোমার কথা, যাতে এই কাজটা তুমি পেয়ে যাও। দরখাস্ত করলেন আইনস্টাইন। যথাসময়ে সাক্ষাৎ করার একটি চিঠি এলো। নিয়োগপত্র নয়। শুধু ইণ্টারভিউ লেটার। তাতেই খুশি হলেন তিনি। নির্ধারিত দিনে ডাইরেক্টরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলেন জুরিখ পলিটেকনিকের দেদীপ্যমান স্নাতক আলবার্ট আইনস্টাইন—ভবিষ্যতের মহাবিজ্ঞানী আইনস্টাইন। পদার্থবিদ্যায় যিনি ছিলেন পারঙ্গম। প্রথমেই তাঁকে প্রশ্ন করা হলো—'পেটেণ্ট সম্বন্ধে তুমি কি জানো ? এই কাজের ধরণ-ধারণই বা কি জানা আছে তোমার ?

—বিন্দুবিসর্গও জানি না।

ডাইরেক্টরের ভ্রূ কুঁচকে ওঠে প্রার্থীর মুখে এই রকম উত্তর শুনে।

তিনি বুঝলেন লোকটি সৎ। একগোছা দরখাস্ত আইনস্টাইনের হাতে দিলেন তিনি ; বললেন, 'এগুলি ভালো করে পড়ে নাও এবং পরে তোমার মূল্যায়নটা প্রতিটি দরখাস্তের ওপর লিখে দেবে। আর দেখবে একই আইডিয়া দু'বার হয়েছে কিনা।' বিষয়টি আগাগোড়া টেকনিক্যাল, বুঝলেন প্রার্থী, এবং আরো বুঝলেন এ ব্যাপারে তাঁর কি রকম অনভিজ্ঞতা। আসলে ডাইরেক্টর চেয়েছিলেন একজন ইঞ্জিনিয়ার, তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্ নয়। যাই হোক, তাঁকে যে কয়টি দরখাস্ত দেখতে দেওয়া হয়েছিল সেগুলি পরীক্ষা করার পর আইনস্টাইন প্রতিটি দরখাস্ত সম্পর্কে যে অভিমত লিপিবদ্ধ করেছিলেন তা পাঠ করে ডাইরেক্টর বুঝলেন, আবিষ্কারের মূল্য বা মূল্যহীনতা যাচাই করার ক্ষমতা এই প্রার্থীর আছে। 'বললেন, কাজটি আসলে করণিকের কাজ, তবে মাইনেটা খুবই সামান্য। যদি রাজী থাকেন, আপনাকে এই পদে নিয়োগ করা হলো আজ থেকেই।'

ভবিষ্যতের বিজ্ঞানী তখন পেটেন্ট অফিসের সামান্য করণিকের চাকরিটা গ্রহণ করলেন। তারিখটা ১৯০২ সালের ২৩শে জুন। পেটেন্ট অফিসে তাঁর কর্মকাল ছিল সাত বছর। এ সময়ে তাঁর জীবনযাত্রা ছিল অতি সাধারণ।

চাকুরী পাওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই আলবার্ট বিয়ে করলেন তাঁর পুরোনো সহপাঠিনী মিলেভা মারিৎশকে। এ বিয়ে আলবার্টের পক্ষে সুখকর হয়নি। ১৯০৪ ও ১৯১০ সালে হানস্ ও এডুয়ার্ড নামে দুটি পুত্র-সন্তানের জন্ম হয়। এ সময়ে আলবার্টের আর্থিক অবস্থা মোটেই ভাল ছিল না। তিনি খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন। বিজ্ঞাপনে তিনি বলেছিলেন তিনি পদার্থবিজ্ঞানের ছাত্র পড়াতে চান। দুজন ছাত্র তিনি পেয়েছিলেন। একজন মরিস সোলোভিন ও অন্যজন কোনরাড হাবিষ্ট। এদের দুজনের সঙ্গে আলবার্টের গড়ে উঠেছিল প্রচণ্ড বন্ধুত্ব। পদার্থবিদ্যার পঠনপাঠনের বাইরেও নানা বিষয়ে তাঁদের মধ্যে গভীরভাবে আলোচনা হ'ত।

॥ তিন ॥

বেস্‌সো নামে আর একজন ইতালিয়ান ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন আইনস্টাইনের বন্ধু।

ইলেকট্রনের বিষয়টি নিয়ে প্রায়ই রাত্রে আলোচনা করতেন। বৈদ্যুতিক তরঙ্গের ক্ষুদ্রতম পদার্থ ইলেকট্রন; এর আছে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব। বেস্‌সো প্রশ্ন করলেন—'একটি ধাতব বস্তুর ভেতর দিয়ে যদি একটি আলোকরশ্মি প্রেরণ করা হয় তার ফলে তড়িৎশক্তিবিহীন অজস্র বস্তুকণার উদ্ভব হয়। এ কথা কি ঠিক?'

মাথা নেড়ে সায় দিলেন আইনস্টাইন।

—কেন? প্রশ্ন করেন বেস্‌সো।

—সেটা তো আমি বোঝাতে পারব না।

তারপর দিনের পর দিন বেস্‌সোর এই প্রশ্নটি নিয়ে আইনস্টাইন চিন্তা করতে থাকেন। অবশেষে তিনি তাঁর বন্ধুকে বললেন—'তোমার ইলেকট্রনের একটা উত্তর খুঁজে পেয়েছি মনে হচ্ছে। কিন্তু তার আগে তোমাকে একটা তত্ত্ব মেনে নিতে হবে যে, আলো জিনিসটা হচ্ছে শক্তিকণার সমষ্টি; বৈজ্ঞানিকরা এর নাম দিয়েছেন কোয়ান্টা, আর আমি বলি ফোটন।'

—এইটা আমার বোধগম্য হতে সময় লাগবে। যাই হোক তুমি বলে যাও।

আইনস্টাইন বলতে থাকেন, 'একটি ফোটন যখন একটি ইলেকট্রনকে আঘাত করে তখন ব্যাপারটা দেখতে ঠিক বিলিয়ার্ড বলের মতো মনে হয়। তুমি নিশ্চয়ই বিলিয়ার্ড টেবিলে দেখেছ যে, স্থির বলটিকে একটি সচল বল যখন গিয়ে আঘাত করে তখন তার নিজস্ব গতি মন্দীভূত হয় আর সেই স্থির বলটি অমনি গতিসম্পন্ন হয়ে ওঠে। ঠিক সেইভাবে, আলোকতরঙ্গের মধ্যস্থ ফোটন যখন আঘাত করে ইলেকট্রনকে, এটা তখন ধাতব প্লেট ভেদ করে যায়।' এই বলে একটি নোট বুক আর পেন্সিল তুলে নিয়ে আইনস্টাইন সমস্ত বিষয়টি এঁকে বুঝিয়ে দিলেন।

অঙ্কশাস্ত্র অনুযায়ী তাঁর সিদ্ধান্তকে বোঝাবার জন্য আইনস্টাইন এই সমীকরণটি $E = hv - w$ সেদিন উদ্ভাবন করেছিলেন। hv ফোটন, E শক্তি, আর w হলো সেই পরিমাণ শক্তি যা ধাতব পদার্থের ওপর আঘাত করতে গিয়ে ইলেকট্রনকে ব্যয় করতে হয়। উত্তরকালে তিনি যে বিখ্যাত সমীকরণটি $E = mc^2$ বিজ্ঞান জগতকে উপহার দিয়ে পদার্থ বিজ্ঞানে এক নতুন যুগের সূচনা করে দিয়েছিলেন, এই $E = hv - w$ সমীকরণটি ছিল তারই পূর্বাভাস। এই সঙ্গে আইনস্টাইন আরো সিদ্ধান্ত করেছিলেন, ব্যবহৃত আলোর রঙের ওপর ঐ ইলেকট্রনের গতি নির্ভর করে। কারণ বেগুনী বা অতিবেগুনী রঙের যে আলো তার ফোটনের মধ্যে যে পরিমাণ শক্তি নিহিত থাকে লাল বা খুব বেশি লাল ফোটনের মধ্যে তত শক্তি থাকে না। বেগুনী বা অতিবেগুনী আলোকের দ্বারাই ইলেকট্রনের বিচ্ছুরণ অত্যন্ত গতিসম্পন্ন হয়ে ওঠে।

—এসব কল্পনা নয় তো?

—কল্পনা? নিউটনই তো বলতেন কোনো একটি মৌলিক বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের জন্ম হয় বিজ্ঞানীর কল্পনা বা অনুমান থেকেই। (Supposition is the mother of all inventions,) প্রমাণটা আসে পরে।

এই সব কথা বলার সময় আইনস্টাইনের চোখ দুটি হয়ে উঠেছে উজ্জ্বল আর সেই চোখের দৃষ্টি যেন বর্তমানকে অতিক্রম করে কোন সুদূর ভবিষ্যতের দিকে প্রসারিত হয়েছে। আলোচনা শেষে দু'দিনের মধ্যেই তাঁর বক্তব্যটি পরিস্ফুট করে একটি প্রবন্ধ লিখলেন আইনস্টাইন। ফোটন-সম্পর্কিত সেই গবেষণা প্রবন্ধটির শিরোনাম ছিল এই রকম— 'The Quantam Law of the Emission and Absorption of Light.'

আমরা যে সময়ের কথা বলছি তখন য়ুরোপে পদার্থ বিজ্ঞানের সেরা মুখপত্র ছিল বার্লিন থেকে জার্মান ভাষায় প্রকাশিত 'Annals of Physics' পত্রিকাটি। যেমন তেমন কোনো বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ এখানে প্রকাশিত হতো না। উঁচুদরের মৌলিক রচনাই এখানে স্থান পেত।

প্রবন্ধটি পাঠিয়ে দিলেন আইনস্টাইন। এক সপ্তাহের মধ্যেই চিঠি এল—'সম্পাদক আনন্দের সঙ্গে আপনার প্রবন্ধটি গ্রহণ করেছেন; পত্রিকার আগামী সংখ্যায় এটি প্রকাশিত হবে।'

প্রবন্ধটি ছাপা হলো বটে, কিন্তু বিজ্ঞানী মহলে সেটিকে কেন্দ্র করে যে ঝড় উঠেছিল তা ইতিহাস হয়ে আছে, বিষয়টি একটু বিশদ-ভাবে আলোচনা করা যাক।

প্রথমে বিজ্ঞান ও জ্ঞানতত্ত্বের কথা বলি। চীনের দার্শনিক কনফুসিয়সের মতে 'কি জানি ও কি জানি না এটা স্পষ্ট করে জানাই জ্ঞান।' এই সোজা কথাটির মধ্যে বর্তমানে বিজ্ঞানে যেভাবে জানার চেষ্টা চলছে তার একটা পরিষ্কার ইঙ্গিত পাওয়া যায় মানুষ তার ইন্দ্রিয় দিয়ে বাইরের জগৎ সম্বন্ধে সব সময় অভিজ্ঞতা আহরণ করে। কিন্তু কেবলমাত্র অভিজ্ঞতা বা অভিজ্ঞতা থেকে পাওয়া তথ্যই বিজ্ঞান নয়। এসব তথ্যের সঠিক রূপ কি, এদের মধ্যে কোনো সম্বন্ধ আছে কি না আর যদি থাকে তা কি, এদের মধ্যে মূল কথা কি এসব জানার চেষ্টা থেকেই এলো বিজ্ঞান। বিজ্ঞানে এ চেষ্টা চলেছে

হু'দিক থেকে। একদিকে সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর সুপরিকল্পিত পরীক্ষা ও নিরীক্ষা করে সঠিক তথ্য জানার চেষ্টা হচ্ছে, অন্যদিকে নানা তথ্য বিশ্লেষণ করে, ভিন্ন ভিন্ন বিশ্লেষণের ফলের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য বিচার করে তাদের সম্বন্ধ কি, তাদের মূল কথা কি অনুমান করে সুস্পষ্ট ধারণা করা হচ্ছে। এইভাবেই আজ পর্যন্ত রূপ পেয়েছে নানা তত্ত্ব। পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও বিচার বিশ্লেষণ, অনুমানের সাহায্যে তত্ত্বরূপে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, ঠিক যেন দুটি পাখা। এই দুটি পাখার ওপর ভর দিয়েই তো যুগে-যুগে বিজ্ঞান চলেছে এগিয়ে। এইভাবেই সম্ভব হয়েছে যুগে যুগে বৈজ্ঞানিক চিন্তার জয়যাত্রা। একদিকে চলছে যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা ও নিরীক্ষা নির্ভুল তথ্য পাবার জন্য। বিজ্ঞানের এই দিকটাকে বলা হয় experimental science বা পরীক্ষামূলক বিজ্ঞান। আবার প্রজ্ঞার ও কল্পনার সাহায্যে নতুন নতুন উপযোগী প্রকল্প ধরে নিয়ে গাণিতিক হিসাব-নিকাশ করে, সূক্ষ্ম যুক্তি বিচার করে ভিন্ন ভিন্ন তথ্য বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণে তৈরি হচ্ছে নতুন নতুন তত্ত্ব। বিজ্ঞানের এদিকটাকে বলা হয় Theoretical science বা তত্ত্বীয় বিজ্ঞান। এই দুটি দিকের কোনোটির গুরুত্ব কম নয়। এই দু'রকম চেষ্টার ওপর নির্ভর করে বিজ্ঞানের জয়যাত্রা।

শুধু তথ্যই বিজ্ঞান নয়। প্রতিদিন খবরের কাগজে আবহাওয়ার যে সংবাদ বেরোয় তার সঙ্গে শেয়ার বাজারের তথ্য-তালিকার মূলত কোনো প্রভেদ নেই। এগুলি তথ্যই, বিজ্ঞান নয়। বিজ্ঞানকে আমরা বরং একটি বৃহদায়তন শিল্পের সঙ্গে তুলনা করতে পারি। পরীক্ষামূলক বিজ্ঞান কাঁচামাল আহরণ করার বিভাগ। তত্ত্বীয় বিজ্ঞান উৎপাদন বিভাগ। এভাবে দেখলে প্রযুক্তিবিদ্যা (Technology) যেন সংশ্লিষ্ট ভোগ্যপণ্য উৎপাদন বিভাগ। আবার যে তত্ত্ব পরীক্ষা-নিরীক্ষায় পাওয়া তথ্যের বিরোধী বা পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে যার সমর্থন মেলে না, তা যত যুক্তিপূর্ণই হোক না

কেন, তত্ত্বের বিজ্ঞানে তা আদৌ স্বীকৃত নয়। বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের গঠন সম্বন্ধে আজ পর্যন্ত অনেক আলোচনা হয়েছে, হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে হবেও। যাঁরাই বিজ্ঞানে মৌলিক অবদান রেখেছেন তাঁদের অনেকেই এ বিষয়ে সুস্পষ্টভাবে অথবা আভাসে কিছু না কিছু বলেছেন। নিউটন তাঁর বহু-বিখ্যাত 'প্রিন্সিপিয়া' ('Principia') বইটির মধ্যে একটি গোটা অধ্যায়ে এবিষয়ে আলোচনা করেছেন। এবিষয়ে আরো গভীর আলোচনা আধুনিক বিজ্ঞানীদের অনেক রচনায় পাওয়া যাবে।

মোটামুটি ভাবে বলা যায় বৈজ্ঞানিক তত্ত্বে মূলত তিনটি অংশ—প্রারম্ভিক প্রকল্প, প্রসঙ্গ ও যুক্তি বিচার বা গাণিতিক হিসাব এবং সিদ্ধান্ত। নিউটন, আইনস্টাইন প্রভৃতি বিজ্ঞানের দিকপালদের মতো কোনো বৈজ্ঞানিক প্রকল্পই পুরোপুরি কাল্পনিক বা মনঃপ্রসূত হবে না, এদের অভিজ্ঞতা দ্বারা সমর্থিত হতে হবে আবার সিদ্ধান্তগুলিরও পরীক্ষা-নিরীক্ষায় পাওয়া তথ্যের সঙ্গে মিল থাকা চাই। এই সঙ্গে আরো একটা বিষয় মনে রাখতে হবে, বৈজ্ঞানিক তত্ত্বে প্রকল্পের স্বল্পতাই সেই তত্ত্বের সৌষ্ঠবের লক্ষণ। এরই একটি দৃষ্টান্ত ছিল 'য়্যানালস্ অব ফিজিক্স' পত্রিকায় পাঠানো আইনস্টাইনের সেই ত্রিশ পৃষ্ঠার নিবন্ধটি। তিনি ছিলেন মূলত তত্ত্বীয় পদার্থবিদ্; তাঁর উদ্ভাবিত তত্ত্বের কথা বলার আগে বিজ্ঞানচর্চার ঐতিহাসিক পটভূমিকাটি একটু জানা দরকার।

যুগ থেকে যুগান্তরে চলে এসেছে বিজ্ঞানের সাধনা।

জীবনযুদ্ধে বাঁচার তাগিদে একদিন মানুষ উদ্ভাবন করল যন্ত্র। তারপর এই যন্ত্রের উন্নতির চেষ্টা থেকে ধীরে ধীরে আবিষ্কার করল যন্ত্র সম্বন্ধে নানা নিয়মকানুন, যা কালে কালে গ্রথিত হয়ে হলো যন্ত্র-বিজ্ঞান—ফলিত ও তত্ত্বীয়। প্রাচীনকালে যন্ত্রের উপযোগিতায় মানুষের সচেতনতার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় বিজ্ঞানী আর্কিমিডিসের সেই প্রসিদ্ধ উক্তিতে—'আমি দাঁড়াবার একটু জায়গা

পেলে এই পৃথিবীটাকে স্থানচ্যুত করে দিতে পারতাম।' কালক্রমে গ্যালিলিও নিউটন প্রভৃতির সাধনায় যন্ত্র সম্পর্কিত তত্ত্বগুলি একটি পূর্ণ সুসঙ্গত বিজ্ঞানের রূপ পেল সপ্তদশ শতাব্দীতে।

তখন দেখা গেল, পার্থিব বস্তুর গতির নিয়ম, বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার নিয়ম যা মানুষ যন্ত্র গড়তে, উন্নত করতে, ব্যবহার করতে গিয়ে ধীরে ধীরে জেনেছে, সে সব নিয়ম কেবল এই পৃথিবীর বস্তুদেরই নিয়ম নয়, এসব নিয়মে চলছে গ্রহ, উপগ্রহ, সৌরজগৎ। ফরাসী বিজ্ঞানী ল্যাগরাজের প্রসিদ্ধ রচনা এই তত্ত্বীয় বিজ্ঞানের যুক্তিপূর্ণ দিকটা সুস্পষ্ট ও সন্দেহাতীত করল, আর অপর ফরাসী বিজ্ঞানী লাপ্লসের সৌরজগতে গ্রহ উপগ্রহের গতি বিশ্লেষণ ও গণনায় এই বিজ্ঞানের সাফল্য সুনিশ্চিত ভাবে প্রমাণিত হয় বিগত শতাব্দীর সূচনাকালে। এই সাফল্য পরবর্তী বিজ্ঞানীদের ওপর এরূপ প্রভাব বিস্তার করল যে, তাঁরা বিজ্ঞানের সব কিছু তথ্য ও ধারণা এই বিজ্ঞানের সাহায্যে বোঝাতে সচেষ্ট হলেন। এই প্রচেষ্টাকে বিজ্ঞানের যান্ত্রিকাদর্শ বা অধিযন্ত্রবাদ (Mechanistic Theory) নামে উল্লেখ করা হয়। এ প্রচেষ্টা গত শতাব্দীর গোড়ার দিকের বিজ্ঞানের প্রগতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত, বর্তমানেও এটি একেবারে বর্জিত হয়নি।

মানুষের সভ্যতার প্রগতির প্রাচীন ইতিহাস অনেকটা যান্ত্রিক ও আগুন ব্যবহারের কুশলতার ইতিহাস। মানুষের প্রথম আবিষ্কার ছিল এই আগুন। এই আগুন ব্যবহারের সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকেই গড়ে উঠেছে 'তাপতত্ত্ব' কিন্তু একটি সুসংহত বিজ্ঞান হয়ে উঠতে এর অনেক সময় লেগেছে। মানুষের সভ্যতার ইতিহাসে একটি নতুন অধ্যায় সংযোজিত হয়েছিল সেদিন যেদিন মানুষ তার যন্ত্র তৈরির দক্ষতা ও আগুনের বা উত্তাপের অভিজ্ঞতা একত্রিত করে তৈরি করল 'বাষ্পচালিত যন্ত্র'। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার—রীতিমতো বৈপ্লবিক আবিষ্কার বললেও চলে। গত শতাব্দীর

গোড়ায় এটাই ছিল ইতিহাসের শিল্পবিপ্লব। বলা বাহুল্য এই আবিষ্কারের পর থেকেই সভ্যতার অগ্রগতি ও বিজ্ঞানের প্রগতি হয়েছে দ্রুততর। এর পরেই গড়ে উঠল বিজ্ঞানে আর একটি নতুন শাখা—তাপ-গতিবিজ্ঞান (Thermodynamics)।

দু'শো বছর আগে যে সব যন্ত্র ব্যবহার করা হতো সেসব চালানো হতো মানুষের নিজের পরিশ্রমে বা তার গৃহপালিত পশুর শ্রমে। যন্ত্রের কাজের শক্তির উৎসটা ছিল প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে চালকের চালনা করা কাজের শক্তি। যন্ত্রবিজ্ঞান আমাদের শিখিয়েছে যে, বস্তুর বা বস্তুসমষ্টির মোট শক্তির হ্রাস বা বৃদ্ধি নেই। শক্তি নিত্য এবং তাপ শক্তিরই এক প্রকাশ। বাষ্প-চালিত যন্ত্রের কাজের শক্তি আসে বাষ্পের শক্তি থেকে। এক্ষেত্রেও মোট শক্তির হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না। শক্তির নিত্যতা বজায় থাকে। ঠিকমত অন্তরিত বস্তুর বস্তুসমষ্টির পরিবর্তনে মোট শক্তির হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না, শক্তি নিত্য, এর রূপান্তর হয় মাত্র। এটাই তাপগতি-বিজ্ঞানের প্রথম সূত্র। গত শতাব্দীর প্রথমার্ধে এটি চূড়ান্তভাবে তত্ত্বরূপে সূত্রবদ্ধ হয়।

বিজ্ঞানের অগ্রগতির ইতিহাসে অবশেষে প্লাঙ্ক, লোরেনৎস আইনস্টাইন প্রভৃতি তত্ত্বীয় পদার্থবিদ্যার দিকপালদের দীর্ঘকালের গবেষণার ভেতর দিয়ে যখন আমরা সাংখ্যায়নিক গতিবিজ্ঞানের পর্বে এসে উপনীত হলাম তখনই বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এল নবযুগ। জগতে যে সব বস্তু দেখা যায়, স্পর্শ করা যায় সে সবই যে সূক্ষ্ম কণা দিয়ে তৈরি অর্থাৎ কণাসমষ্টি—এই ধারণা অতি প্রাচীন। নিউটনের সময় থেকেই য়ুরোপের বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীরা বস্তুকে চলমান কণাসমষ্টি ধরে পদার্থের বিভিন্ন অবস্থা ও অবস্থার পরিবর্তন ব্যাখ্যা করে এসেছেন। এল অণুতত্ত্ব ও সাংখ্যায়নিক পদার্থবিদ্যা। জানা গেল যে, জগতের সব বস্তুই ছোট ছোট অণু দিয়ে গঠিত। অণুর অস্তিত্ব ও মূল ধর্মগুলি বর্তমানে বিজ্ঞানের নানা পরীক্ষা-

নিরীক্ষায় সমর্থিত হয়েছে, এবং অণুর ধারণা আজ বিজ্ঞানে সন্দেহাতীত ভাবে স্বীকৃত।

কিন্তু এই শতকের গোড়াতেই পরীক্ষা-নিরীক্ষায় পাওয়া গেল যে, পরমাণুই ক্ষুদ্রতম একক নয়, এও ভাঙা যায়। এই পরমাণুরা ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন প্রভৃতি ছোট ছোট কণা দিয়ে তৈরি। এরাও গতিশীল। এ জগতে সবই চলছে, কিছুই স্থির, নিশ্চল নয়। অণু, পরমাণু বা তাদের চেয়ে অনেক ছোট ইলেকট্রন প্রভৃতির গতির নিয়ম কি, তাদের চলার ছন্দ কি? প্রথমে গ্যালিলিও-নিউটনের সনাতনী গতিবিজ্ঞানের সাহায্যে এদের গতির প্রকৃতি বুঝবার চেষ্টা হয়। কিন্তু সে চেষ্টা সকল ক্ষেত্রে সফল হয়নি। অণু-জগতের সকল রহস্যের উদ্‌ঘাটনে যেসব বিজ্ঞানীর চিন্তা ও গবেষণা চূড়ান্তভাবে সফল হয়েছে তাঁরা প্রত্যেকেরই সনাতনী পদার্থ-বিদ্যার কাঠামোর বাইরে চলে গিয়ে ঘটিয়েছেন পদার্থবিদ্যার আধুনিকীকরণ। এইভাবেই জন্ম হয় আধুনিক পদার্থবিদ্যার (New Physics)। এরই দু'জন পুরোধা ছিলেন—ম্যাক্স প্লাঙ্ক ও আলবার্ট আইস্টাইন। প্লাঙ্ক কোয়ান্টামবাদের প্রবর্তক, আর আইনস্টাইন আপেক্ষিকতাবাদের রচয়িতা।

॥ চার ॥

১৯০৫ সালটি আইনস্টাইনের জীবনে স্মরণীয় হয়ে আছে ছুটি কারণে—প্রথম, তাঁর উদ্ভাবিত আপেক্ষিকতাবাদ বা থিওরি অব রিলেটিভিটি, দ্বিতীয়, তাঁর প্রথম পুত্র হ্যানস আলবার্টের জন্ম। আইনস্টাইনের বিস্ময়কর তত্ত্বটি কিন্তু একদিনে উদ্ভাবিত হয়নি—এর পিছনে ছিল তাঁর বহুদিনের চিন্তা। তাঁর আবিষ্কারের নেপথ্যে কাহিনীটা কম চিত্তাকর্ষক নয়। সেই কাহিনী এখানে একটু বলছি।

যেদিন থেকে তাঁর মাথায় আপেক্ষবাদের চিন্তাটা এসেছিল সেদিন থেকে এটিই হয়ে উঠেছিল আইনস্টাইনের সর্বক্ষণের চিন্তার বিষয়। পেটেন্ট অফিসে কাজ করবার সময়েও তিনি এই নিয়ে ভাবতেন। এমন কি বাড়িতে ফিরে অনেক রাত পর্যন্ত তিনি এই নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতেন। যদি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে বুঝতে হয় তাহলে সকলের আগে আমাদের মুক্ত হতে হবে পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের সংস্কার থেকে। আমরা যে দেখি, শুনি এবং স্পর্শ করি ইন্দ্রিয়ের এইসব ক্রিয়া আমাদের বোকা বানাতে পারে।

—নিশ্চয়ই। একটি ফুলের সুবাস, একটি কুঁড়ির রঙ যে কোনো ছু'জন লোকের কাছে এক রকম মনে নাও হতে পারে। কিন্তু বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে তুমি বোঝাবে কেমন করে?

—সংখ্যা দিয়ে, প্রতীক দিয়ে, এই কথা বলতে বলতে তিনি বিছানায় শুতে যেতেন। ঘুম কিন্তু হতো না—ঘুমের মধ্যেও ঐ চিন্তা তাঁকে পরিত্যাগ করত না।

আলোর গতির কথা চিন্তা করতে গিয়ে তাঁর মনের মধ্যে সময়ের কথাটা জাগল। এই সময় সম্পর্কে নিউটন যা বলেছেন, তার সঙ্গে আইনস্টাইনের চিন্তার তফাৎ ছিল অনেকখানি।* বাইরের কোনো কিছুর সঙ্গে সম্পর্ক ব্যতিরেকেই সময়ের স্রোত নিত্য সমান ভাবে বয়ে চলে; সময়—গাণিতিক সময়—শাশ্বত। নিউটনের এই মতবাদ[১] কিন্তু আইনস্টাইন মেনে নিতে পারলেন না। তিনি তাঁর গবেষণার দ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে, একটা কিছুর ওপর সময়কে নির্ভর করতে হয়; সময় সর্বদাই দ্রষ্টার সম্পর্কে সম্পর্কিত। একদিন সন্ধ্যায় চকোলেট চিবুতে চিবুতে বেস্‌সোকে জিজ্ঞাসা করলেন তিনি—'আচ্ছা, তোমার কি কখনো এটা খেয়াল হয়েছে যে অনেক ঘটনা যেগুলি যুগপৎ ঘটছে বলে মনে হয় তা সত্যি সে রকম নয়?'

উত্তরে বেস্‌সো বললেন—'আজ সকালে যখন আমি বাড়ি থেকে বেরুলাম তখন একটি কারখানার বাঁশী তীক্ষ্ণভাবে বেজে উঠল শুনলাম। তুমি কি বলতে চাও এই দুটো ঘটনা—বাড়ি থেকে আমার বেরুনো আর ঐ বাঁশী বেজে ওঠা—যুগপৎ নয়?

—বাঁশীর শব্দটা এসেছিল একটু দূর থেকে এবং এটা তোমার কানে পৌঁছতে কিছু সময় লেগেছিল, যদিও স্বীকার করছি সেটা খুবই কম সময়। তাহলেই বুঝতে পারছ যে বাঁশীর আওয়াজ আর তোমার বেরুনো নিশ্চয়ই যুগপৎ বা ঠিক একই সময়ের ঘটনা নয়।

—তাহলে তুমি বলতে চাইছ যে, গতি, সময় আর ঘটনার দ্রষ্টার স্থান—এই তিনটি বিষয়ের ওপর নির্ভর করে যুগপৎ ঘটার ব্যাপারটা।

১. 'Absolute, true, and mathematical time, of itself and from its own nature, flows equally without relation to anything external'. Newton : **Principia Mathematica** ('Mathematical Principles')

believe there is a Reality outside us.' অর্থাৎ আমি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করি যে আমাদের অস্তিত্বের বাইরে একটি বাস্তব বা দিব্যসত্তা বিদ্যমান।' মানবদরদী তিনি হতে পেরেছিলেন এই জন্যই।

তাঁর পঁচাত্তর বছরের জীবনটা আমরা যদি শ্রদ্ধার সঙ্গে আলোচনা করি তাহলে দেখতে পাব সামাজিক মানবতাবোধই এই বিজ্ঞানীর বিশ্বমানবিকতার মূল উৎস। জীবনের শেষ দুই দশক কাল তাঁকে আমরা দেখতে পাই বিজ্ঞানের তাবৎ নিয়মের ক্ষেত্রে একাগ্রচিত্তে এই মানবতাবোধকেই খুঁজতে। শিক্ষা-দীক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, সমাজ পুনর্গঠন, সরকারী অর্থ ও খাদ্য প্রভৃতির সুষ্ঠু বণ্টনের ক্ষেত্রে তিনি সর্বদাই সন্ধান করেছেন এই সামাজিক সাম্যকে। ব্রুকলিন পলিটেকনিকের এক শ্রমিক সভায় আইনস্টাইন বলেছিলেন—'মানুষের কাছ থেকে খ্যাতির জয়মাল্য লাভ করব, এইজন্যই বিজ্ঞান জানতে হবে বা তা নিয়ে কাজ করতে হবে—এ যেন না হয়। সাধারণ লোকের কথা ভাবো, তাদের ভাগ্য নিয়ে খেলা বন্ধ করো, শ্রমিকদের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করো, জিনিসপত্র সকলের মধ্যে যথাযথ বণ্টনের ব্যবস্থা করো যাতে আমাদের জন্মটা সাধারণের কাছে অভিশাপ না হয়ে আশীর্বাদ স্বরূপ হয়।'

পৃথিবীর আর কোন বিজ্ঞানীর মুখে আমরা এমন দরদভরা কথা কখনো শুনি নি। জাতিতে আইনস্টাইন ছিলেন ইহুদী। বিশ্ববাসীর কাছে তিনি নির্যাতিত ইহুদীদের কথা অত্যন্ত সহৃদয়তার সঙ্গে প্রচার করতেন। ইহুদীদের উপর নাৎসীদলের দমননীতির তিনিই ছিলেন কঠোর সমালোচক। এজন্য তাঁকে জন্মভূমি জার্মানি পরিত্যাগ করে চলে আসতে হয়েছিল। বলতে গেলে এই ইহুদী সমস্যা সমাধানের জন্য তিনি জীবনব্যাপীই আন্দোলন করেছেন এবং চাঁদা তোলার জন্য য়ুরোপ ও আমেরিকার একাধিক কনসার্টে অংশ

গ্রহণ করে বেহালা বাজিয়েছেন। এজন্য তাঁকে জাতীয়তাবাদীর অপবাদ নিতে হয়েছিল।

কিন্তু তাঁর নির্ভীক, উদার ও বলিষ্ঠ চিন্তা সংকীর্ণ জাতীয়তার বহু উর্ধ্বে থেকে সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের জন্য সর্বদাই ব্যাকুল থাকতো। এই ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন রবীন্দ্রনাথের সগোত্র। কবির মতো এই বিজ্ঞানীরও আদর্শ ছিল বিশ্বমানবিকতার আদর্শ। ১৯৩১ সালে য়ুরোপ সফরে গিয়ে কবি যখন জার্মানিতে উপনীত হলেন তখন একদিন তিনি বার্লিনে আইনস্টাইনের বাসভবনে গিয়ে তাঁর সঙ্গে আলাপ করে খুবই মুগ্ধ হয়েছিলেন। কবি অনুভব করেছিলেন, এই বিজ্ঞানীর জীবনের বিভিন্ন চিন্তায়, কর্মে বিশ্বমানবতাবোধ কি আশ্চর্যভাবেই না ফুটে উঠেছে। তাঁর মধ্যে এই বোধটাই তীব্র ছিল বলেই না আইনস্টাইন সর্বপ্রকার শোষণের বিরোধিতা করেছেন।

স্বাধীনতার প্রতি ছিল তাঁর গভীর অনুরাগ। একনায়কদের (Dictator) স্বৈরাচারী শাসনকে তিনি কখনোই সহ্য করতেন না —বারবার এদের প্রতি তিনি জানিয়েছেন কঠিন ধিক্কার। একটা দৃষ্টান্তের উল্লেখ করি। ১৯২৭ সালে ইতালির একনায়ক মুসোলিনী বিজ্ঞানী ভোল্টার জন্মশতবার্ষিকীতে সারা বিশ্বের খ্যাতনামা বিজ্ঞানীদের নিয়ে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠান করেন। একমাত্র আইনস্টাইনই এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেননি।

তেমনি স্বৈরাচারী হিটলারের কাছেও তিনি কোনদিন আনুগত্য স্বীকার করেন নি। যুদ্ধোন্মাদ হিটলারের কথায় বিভ্রান্ত হয়ে জার্মানীর সেরা বুদ্ধিজীবীরা জার্মানির সামরিক অভ্যুত্থানকে সমর্থন জানিয়ে একটি চিঠি প্রকাশ করেন। তাতে নিরানব্বই জনের স্বাক্ষর ছিল একমাত্র আইনস্টাইন বাদে। এই ঘৃণ্য কাজের নিন্দা করতে তিনি কোন রকম দ্বিধা বা সংকোচ করেন নি। এজন্য তাঁকে

—ঠিক বলেছ।

এই যুগপৎ বিষয়টিই (বিজ্ঞানের ভাষায় যাকে বলা হয় 'simultaneity') চিন্তা করতে করতে আইনস্টাইন আপেক্ষিক বা 'relativity' শব্দটা ব্যবহার করতে আরম্ভ করেছিলেন। এরই সূত্র ধরেই তো বিজ্ঞান জগতের এই কলম্বাস অজানা সমুদ্রে পাড়ি দিয়ে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের রহস্য উদ্ঘাটন করেছিলেন। সময়ের কথা চিন্তা করতে করতে গতির (motion) বিষয়টিও তাঁর চিন্তার মধ্যে এসে গিয়েছিল। সমস্ত গতিই আপেক্ষিক, কারণ গতির পৃথক পৃথক দ্রষ্টার কাছে এর পরিমাপটা পৃথকভাবেই প্রতীয়মান হয়। একদিন মিলেভাকে তিনি একটি দৃষ্টান্ত সহকারে বোঝালেন এই বিষয়টি। 'মনে কর, আমি একটি রেলগাড়ি চড়ে যাচ্ছি। জানলা দিয়ে বাইরের দিকে মুখটা বাড়িয়ে দেখতে পেলাম একটা দাঁড়কাক উড়ে যাচ্ছে। আমার কাছে মনে হলো দাঁড়কাকটা কিন্তু ট্রেনের গতির সঙ্গে পাল্লা দিতে পারছে না এবং খুব মন্থর ভাবেই উড়ে চলেছে আকাশে। কিন্তু ঠিক ঐ সময়ে নীচে মাটিতে দাঁড়িয়ে কেউ যদি ঐ উড়ন্ত দাঁড়কাকটাকে লক্ষ্য করতো তাহলে সে নিশ্চয়ই বলতো যে, রেলগাড়ির চেয়ে দ্রুত বেগেই উড়ে চলছে নভোচারী ঐ বিহঙ্গমটি।'

—কিন্তু এর থেকে তোমার সিদ্ধান্তটা কি দাঁড়াচ্ছে, আলবার্ট?

—All motion is relative.

বিজ্ঞান জগতের আর একটি বিস্ময়কর তত্ত্ব জন্ম নিল। যে বিষয়টা নিয়ে পৃথিবীর পদার্থবিদ্‌রা এতকাল হিমসিম খেয়ে এসেছেন। অথচ ভাবলে পরে আশ্চর্য হতে হয় যে, এহেন যে মানুষ তিনি অনায়াসেই শিশুদের জগতের মধ্যে প্রবেশ করতে পারতেন। রঙীন কাঠের টুকরো সাজিয়ে পুত্র হ্যানস আলবার্টের জন্য দুর্গ তৈরি করে দিতেন ; আবার কখনো কখনো তাকে সঙ্গে নিয়ে বার্ন শহরের ফোয়ারা এবং ফুলের বাগান ঘুরিয়ে নিয়ে আসতেন।

রাতে ঘুমের সময় ছেলে যদি ছটফট করত অমনি তাঁর বেহালাটি বাজিয়ে হ্যানসকে ঘুম পাড়াতেন। তারপর আবার তিনি তাঁর চিন্তার জগতে ডুবে যেতেন। এইভাবে ক্রমাগত সপ্তাহের পর সপ্তাহ গতির বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করতে করতে আইনস্টাইন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন—পরমাণু থেকে নক্ষত্র, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় বস্তু সর্বদা গতিশীল। সিদ্ধান্ত থেকে আবার মনের মধ্যে একটি নতুন প্রশ্নের উদয় হয়—পৃথিবীতে একটি রেলগাড়ির গতি পৃথিবীর সম্পর্কে আপেক্ষিক। কিন্তু পৃথিবীর বাইরে এই গতিটা কার সঙ্গে আপেক্ষিক ?

জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা হিসাব করে আলোর গতি প্রতি সেকেণ্ডে ১,৮৬,০০০ মাইল নির্ধারণ করেছিলেন। এই বিষয়টি নিয়ে গভীর ভাবে গবেষণা[১] করতে করতে আইনস্টাইন এখন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, 'মহাশূন্যে একমাত্র আলোর গতিই হচ্ছে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে অপরিবর্তনীয় জিনিস।' (The velocity of light in free space is the only constant in the universe.)

একদিন রাতে তাঁর বাসভবনে মিলেভা ও বেস্সোর সঙ্গে এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছিলেন তিনি। বললেন—'একমাত্র' আলো ভিন্ন আর কোনো বস্তু ঠিক একভাবে থাকে না। আলোর গতি সর্বদাই একপ্রকার, এর কোনো এদিক-ওদিক হবার উপায় নেই।

—মহাশূন্যে এটা সত্য হতে পারে, কিন্তু ঐ আলো সম্পর্কেও কি তোমার এই সিদ্ধান্ত সত্য ?

টেবিলের উপর রাখা আলোকদানির দিকে তাকিয়ে এই মন্তব্যটি করলেন মিলেভা।

১। আইনস্টাইন যা কিছু গবেষণা করতেন তা শুধু খাতায় অঙ্ক কষে করতেন, কোনো ল্যাবোরেটারিতে কোনো যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হতো না তাঁর। এ্যাটম বোমার মূল তত্ত্বটা তো তিনি অঙ্ক কষেই উদ্ভাবন করেছিলেন। এইজন্যই তাঁকে তত্ত্বীয় পদার্থবিজ্ঞানী বলা হতো। তাঁর মস্তিষ্ক ছিল তাঁর গবেষণাগার।

—একটি মোমবাতি, একটি প্রদীপ, একটি ইলেকট্রিক আলোর বালব অথবা একটি নক্ষত্র, যেখান থেকেই আলো বিচ্ছুরিত হোক না কেন, এর গতি অপরিবর্তনীয়। বললেন বিজ্ঞানী আইনস্টাইন তাঁর পত্নীকে।

—মনে কর একটি রকেটের ওপর আলো রাখা হলো। তখন এর গতি কি বৃদ্ধি পাবে না? প্রশ্ন করেন বেস্‌সো।

কাঠের তৈরি যে হেলানো চেয়ারটিতে আইনস্টাইন উপবিষ্ট ছিলেন তার হাতলের ওপর আঙুলগুলির চাপ দিয়ে তিনি উত্তর দিলেন—'সেই রকেটের উপর রাখা আলোর গতি তখন হবে সেকেণ্ডে ১,৮৬,০০০ হাজার মাইল আর তার সঙ্গে যোগ করতে হবে রকেটের গতি। কিন্তু কোনো কিছুই আলোর গতিকে অতিক্রম করতে পারে না। ঈথরবিহীন পৃথিবীতে আলোর গতি সম্পর্কে অপরিবর্তনীয়তার তত্ত্বটি ১৯০৫ সালে প্রকাশিত হওয়ার পর বিজ্ঞানী মহলে খুবই আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছিল।

পোল্যাণ্ডের বিখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী লিওপ্রোল্ড ইন্‌ফেল্ড, যিনি একসময় আইনস্টাইনের খুব কাছের মানুষ ছিলেন তিনি আইনস্টাইনের এই ১৯০৫ সালের কাজ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছিলেন, বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইন ছিলেন নিঃসঙ্গ। অন্য জাতের বিজ্ঞানী। কারণ আইনস্টাইন প্রথাগত ভাবে পদার্থবিদ্যা অধ্যয়ন করেননি। তিনি ছিলেন পেটেণ্ট অফিসের কেরানী। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এ বছর আইনস্টাইন মোট চারটি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখেছিলেন, প্রবন্ধগুলো সবই ছাপা হয়েছিল "অ্যানালেন ডেয়ার ফিজিক" পত্রিকায়। তাঁর এ পর্বের প্রথম প্রবন্ধটিই পরবর্তীকালে তাঁকে নোবেল প্রাইজে ভূষিত করেছিল।

১৯০৫।

জুন মাসের সকাল। বার্ন থেকে জুরিখ যাচ্ছেন আইনস্টাইন।

তাঁর গন্তব্যস্থল ছিল 'অ্যানালস অব ফিজিক্স' পত্রিকার অফিস। একটি প্রবন্ধ দিতে গিয়েছিলেন সম্পাদককে। প্রবন্ধটির বিষয়বস্তু জটিল, একমাত্র গাণিতিকরা ভিন্ন বুঝবে না, তথাপি তাঁর বিশ্বাস ছিল যে রকম সরল ভাষায় তিনি এটি লিপিবদ্ধ করেছেন তা সাধারণ লোকের বোধগম্য হবে। যথাসময়ে বার্নে ফিরে এলেন আইনস্টাইন। দেহ-মন ভীষণভাবে ক্লান্ত—একটি মাত্র চিন্তাই তখন তাঁর মস্তিষ্কের মধ্যে আবর্তিত হচ্ছিল: 'পদার্থবিজ্ঞানীরা কি আমার এই তত্ত্ব—এই আপেক্ষবাদ স্বীকার করে নেবেন? সাধারণ জ্ঞান বা পঞ্চেন্দ্রিয়ের সাহায্যে তাঁরা কি এই তত্ত্ব বুঝতে পারবেন? না পারুন, বা না গ্রহণ করুন, আমি আমার উদ্ভাবিত এই তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করতে, ব্যাখ্যা করতে আমার জীবন দেব।'

পত্রিকায় প্রবন্ধটি প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানীমহলে যে রকম আলোড়ন দেখা দিয়েছিল বিজ্ঞানের ইতিহাসে তার দৃষ্টান্ত খুব বেশি নেই। কেউ এই তত্ত্বকে বিপ্লব আখ্যা দিলেন। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এর উদ্ভাবক কিন্তু মনে করতেন এটা বিপ্লব নয়; শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে পৃথিবীতে যে সব বৈজ্ঞানিক চিন্তা দেখা দিয়েছে, তাদেরই পরিণতি হিসাবে এসেছে এই নতুন তত্ত্ব—এই আপেক্ষিকতাবাদ। পূর্বতন বিজ্ঞানীদের চিন্তাই তো এজন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করে রেখেছিল। বিরূপ সমালোচনা হলো অনেক পত্র-পত্রিকায়। লণ্ডনের বিখ্যাত 'টাইমস' কাগজে সেদিন এই মন্তব্যটি প্রকাশিত হয়েছিল—'A patent clerk in Berne has attacked time-honoured theories and put forth new theories of the Universe understood only by a few high priests'.

কাগজ পড়ে আইনস্টাইন বলেছিলেন—'কিছু যায় আসে না। পৃথিবীতে কেউ যদি কোনো কিছুর প্রবর্তক হতে চায় তবে তাকে একাকী পথ চলতে হবে।' কিন্তু সত্যিকার সমঝদার দু'চারজন

খ্যাতনামা বিজ্ঞানীদের কাছ থেকে তিনি প্রশংসামূলক পত্র পেলেন, পেলেন অকল্পিত অভিনন্দন। ক্রাকাউ বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ পোলিশ অধ্যাপক উইটকোস্কি প্রবন্ধটি পাঠ করার পর প্রকাশ্যে এই সুন্দর মন্তব্যটি করেছিলেন—'এতকাল বাদে বিজ্ঞান জগতে এক নতুন কোপার্নিকাসের আবির্ভাব ঘটল। নিকোলাস কোপারনিকাস জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি জাতিতে ছিলেন পোলিশ। তাই একজন পোলিশ বিজ্ঞানীর দ্বারা এরূপ আখ্যা নিঃসন্দেহে সম্মানজনক। তাছাড়া বার্লিনের প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ম্যাক্স্ প্ল্যাঙ্ক (১৮৫৮-১৯৪৭) (ইনিই কোয়াণ্টাম তত্ত্বের উদ্ভাবক ও আইন-স্টাইনের পূর্ববর্তী ছিলেন) নিজে দেখা করলেন আইনস্টাইনের সঙ্গে। আর প্রখ্যাত জার্মান ম্যাক্স ভন লাউ বার্লিন থেকে বার্নে এসে আইনস্টাইনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। এক রেস্তোরাঁতে বসে আলাপ করতে করতে ভন লাউ সবিস্ময়ে বলেছিলেন—'আপনার বয়স যে এত কম আমার তা ধারণাই ছিল না।'

—আমার বয়স ছাব্বিশ বছর।

—মাত্র ছাব্বিশ বছর! আর আপনি কি না ল্যাবোরেটরির তথাকথিত পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাহায্য ব্যতিরেকেই কেবলমাত্র গণিতের সাহায্যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের রহস্য এমন গভীরভাবে উপলব্ধি করেছেন যা এতকাল আমাদের ধারণার বাইরে ছিল।

আইস্টাইনের এই আপেক্ষিকতার সূত্র কিন্তু সে সময় সবাই মেনে নিতে পারেন নি। প্রখ্যাত বিজ্ঞানী পোঁয়েকারে আইন-স্টাইনের বক্তব্যের বিরোধী ছিলেন। তিনি ১৯১২ সাল পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন। এ সময়ে তিনি নানা স্থানে আপেক্ষিকতা সূত্র নিয়ে বক্তৃতা করেন। কিন্তু কোনখানেই তিনি আইনস্টাইনের নাম পর্যন্ত উচ্চারণ করেন নি। তবে তাঁর মৃত্যুর বছর খানেক আগে তিনি আইস্টাইনের প্রশংসা করে জুরিখ পলিটেকনিকে একটি চিঠি লেখেন।

প্রচলিত লৌকিক ভাষায় আইনস্টাইন উদ্ভাবিত আপেক্ষবাদ

তত্ত্ব ব্যক্ত করা সহজসাধ্য নয়। তাই সেদিন যুগান্তকারী এই আবিষ্কার খুব কম লোকের কাছেই বোধগম্য হয়েছিল। গল্প আছে, গ্রীকবীর আলেকজান্দার যখন বালক ছিলেন, তখন জ্যামিতিশাস্ত্র তাঁর বিশেষ বোধগম্য হতো না। তিনি তাঁর শিক্ষাগুরু অ্যারিস্টট্‌লকে একবার জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ইউক্লিডের পঞ্চম প্রতিজ্ঞা আয়ত্ত করবার কোনও সহজ উপায় আছে কিনা। অ্যারিস্টট্‌ল তার উত্তর দেন যে, জ্যামিতি শাস্ত্রে কোন প্রশস্ত রাজপথ নেই। আমাদেরও তাই মনে হয়, জটিল অঙ্কশাস্ত্রে সম্যক জ্ঞান ভিন্ন রিলেটিভিটি তত্ত্ব সাধারণের পক্ষে বোধগম্য করা অসম্ভব। আর শুধু অঙ্কশাস্ত্র নয়। পদার্থবিদ্যায়ও যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি অবশ্য প্রয়োজনীয়। স্যার আর্থার এ্যাডিংটন তাই বলতেন: 'Only a few people fully understood relativity theory—not more than three perhaps. And Einstein is one of the three persons who understand Einstein best.' যুগ-যুগান্তের বিজ্ঞান সাধনার ইতিহাসে আমরা এমনি দৃষ্টান্ত অনেক দেখতে পাই। কোন একটি নতুন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হওয়া মাত্র গৃহীত হয় না। আবিষ্কারককে বহু বাধা এবং বিরূপ সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়। আইনস্টাইন তাঁর উদ্ভাবিত রিলেটিভিটি তত্ত্ব সম্পর্কে সুনিশ্চিত ছিলেন বলেই না তিনি বিরূপ সমালোচনায় কখনো বিচলিত বোধ করেন নি।

আইনস্টাইন তাঁর গবেষণার কাজে এগিয়ে চলতে থাকেন। একদিন বেস্‌সোকে জিজ্ঞাসা করেন—'আচ্ছা তোমার মনে কি কখনো এই চিন্তা জেগেছে যে, জড়পিণ্ড (mass) এবং শক্তি (energy) পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত, এরা পৃথক নয়।

—আমার কাছে কিন্তু তা মনে হয় না।

আপত্তি জানিয়ে বলেন বেস্‌সো।

—কিন্তু আমার কাছে এটাই পরম সত্য যে, 'mass and

energy are bound up with one another.' পদার্থ ও শক্তি এক এবং অভিন্ন।

সেটা কি করে সম্ভব? জড়পিণ্ড বলতে আমি বুঝি একটি মেদবহুল স্থূলকায় মানুষ যে পরম আলস্যভরে একটি চেয়ারে বসে আছে আর শক্তি হচ্ছে যেন একটি সক্রিয় মানুষ যে সর্বদাই চঞ্চল।

—এই কথা ঠিক যে জড়পিণ্ডকে দেখা যায় এবং মনে হবে নিষ্ক্রিয় ; শক্তি আমাদের দৃষ্টিগোচর নয়, তবে এ সর্বদাই সক্রিয়। তথাপি আমি বিশ্বাস করি যে, আমাদের পঞ্চেন্দ্রিয়ের কাছে যা জড়পিণ্ড বলে প্রতীয়মান তা হলো প্রকৃতপক্ষে শক্তিসমষ্টির একটি জটিল রূপ।

—তা হলে তুমি কি বোঝাতে চাও?

সেই উদ্দীপনাময় আলোচনার উপসংহারে মহাবিজ্ঞানীর মুখ থেকে উচ্চারিত হয়েছিল পদার্থ বিজ্ঞানের একটি নতুন তত্ত্ব—'matter is energy and energy is matter'—যে তত্ত্ব এতদিনকার প্রচলিত ধারণা একেবারে পাল্টে দিয়েছিল।

'বিষয়টি যে কি রকম বিস্ময়কর সেটি সংখ্যা দিয়ে প্রকাশ করলে কিছুটা বুঝতে পারবে। এক কিলোগ্রাম পদার্থকে যদি শক্তিতে রূপান্তরিত করা যায় তাহলে যে পরিমাণ শক্তি পাওয়া যাবে তার স্থায়িত্ব হবে পঁচিশ বিলিয়ন কিলোওয়াট ঘণ্টা। গোটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিদ্যুৎ উৎপাদন শিল্পে দু'মাস ধরে যে পরিমাণ শক্তি উৎপন্ন হতে পারে এই শক্তিকে তার সঙ্গে তুলনা করতে পারো। আবার ঠিক ঐ পরিমাণ কয়লা পুড়িয়ে ৮৫ কিলোওয়াট ঘণ্টার তুল্য যে শক্তি উৎপন্ন হবে তার সঙ্গে এই আজগুবি সংখ্যার তুলনা করা যেতে পারে।

এই চিন্তারই ফলশ্রুতি ছিল আইনস্টাইন উদ্ভাবিত সেই বিখ্যাত সূত্রটি $E=mc^2$ যার ওপর দাঁড়িয়ে আছে তাঁর আপেক্ষবাদের কাঠামোটি।

১৯০৮।

পলিটেকনিকে যিনি আইনস্টাইনের গণিতের শিক্ষক ছিলেন সেই অধ্যাপক হার্মান মিনকাউস্কি বিজ্ঞানীদের সভায় তাঁর ছাত্রের উদ্ভাবিত তত্ত্বের একদিন বক্তৃতা দিলেন। ছাত্রের গৌরবে শিক্ষকের গৌরব—জ্ঞান-জগতের এটি একটি চিরন্তন সত্য। সেই সত্য আমরা যেন আর একবার চাক্ষুষ করলাম। এখানে উল্লেখ্য যে, মিনকাউস্কি জ্যামিতিক আকার দিয়ে আপেক্ষিকতত্ত্বের অসাধারণত্ব প্রতিপন্ন করেছিলেন। এর ফলে আইনস্টাইনের কাছে নিমন্ত্রণ আসতে লাগল প্রকাশ্যে এই বিষয়ে বক্তৃতা দেবার জন্য। যে সব বিজ্ঞানী এতকাল এই তত্ত্বকে স্বীকৃতি দিতে বিলম্ব করেছেন তাঁদের কাছ থেকেই নিমন্ত্রণ এসেছিল। সালজবুর্গে জার্মান পদার্থবিদদের কংগ্রেসে তিনি প্রথম বক্তৃতা দিলেন। এর কিছুকাল বাদেই লিডেন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নিমন্ত্রণ এলো।

কয়েক মাস পরের কথা। জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত পদার্থবিদ্ অধ্যাপক ক্লাইনার বার্ন শহরে এসে আইনস্টাইনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন।

—পেটেণ্ট অফিসের কাজ ছেড়ে দিন। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি পদের জন্য দরখাস্ত করুন।

প্রস্তাবটি তাঁর মনে লাগল। যাঁর কাছে জীবনের সর্বস্ব ছিল পদার্থবিদ্যা, তাঁর কাছে পেটেণ্ট অফিসের এই কাজ ছিল মূল্যহীন। প্রস্তাবটির সুবিধা এবং অসুবিধা দুই দিকই তিনি বিবেচনা করলেন। প্রথম কথা শিক্ষক হিসাবে তাঁর কোন অভিজ্ঞতার কৃতিত্ব ছিল না; দ্বিতীয় কথা, অধ্যাপনার চাকরি নিলে গবেষণার সময় তিনি পাবেন না। তারপর এখানকার পরিবেশ বিশেষ করে বেস্‌সো ও হ্যালারের সান্নিধ্য ছেড়ে যেতে হবে—এই দু'জনের সঙ্গে বিজ্ঞান নিয়ে, স্বাধীনতা নিয়ে, সত্য নিয়ে আলোচনা করে তিনি আনন্দ পেতেন।

প্রথম দিনের লেকচার শুনবার জন্য ছাত্রদের মধ্যে অধ্যাপক

ক্লাইনারও উপস্থিত ছিলেন। একটু কঠিন মনে হলেও, চমৎকার লেগেছিল তাঁর কাছে এই বক্তৃতা। তিনি জুরিখে ফিরে গিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষকে জানালেন—এমন একজন বিজ্ঞানীকে অধ্যাপক হিসাবে পেলে এখানকার গৌরব বৃদ্ধি পাবে। সেকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পদ লাভ করা সহজসাধ্য ছিল না। যিনি অধ্যাপক হবেন তাঁকে পদপ্রার্থী হওয়ার আগে কিছুকাল "প্রিভাট্ডোৎসেন্ট" হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকতে হতো। এ সময়ে তাঁকে তাঁর পছন্দমাফিক বিষয়ে ছাত্রদের সামনে বক্তৃতা দিতে হতো। অবশ্য এই বক্তৃতাদানের কোন বাধাধরা নিয়ম ছিল না। আর এই বক্তৃতার দক্ষিণা ছিল খুবই সামান্য। ছাত্ররা বক্তৃতা শুনে যা দিতেন তাতেই সন্তুষ্ট থাকতে হতো বক্তৃতাদানকারীকে। আইনস্টাইন এ ব্যবস্থায় রাজী হলেন। ১৯০৮ সালের গোড়ায় শুরু করলেন বক্তৃতাদান। কিন্তু আর্থিক কারণের জন্য তিনি তখনই পেটেন্ট অফিসের চাকুরী ছাড়তে পারলেন না। এভাবে চললো প্রায় বছর খানেক।

পরের বছর, ১৯০৯ সালের মাঝামাঝি। আইনস্টাইন আবেদন জানালেন জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয়ে। এই পদের অন্যতম প্রার্থী ছিলেন অষ্ট্রীয়ার সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রতিষ্ঠাতার পুত্র ফ্রীডরিখ আড্লার। জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্যরা কোন বিতর্কের মধ্যে না গিয়ে এককথায় ফ্রীডরিখ আডলারকে নির্বাচিত করলেন। কিন্তু আডলার ছিলেন আদর্শবাদী মানুষ। তিনি যখন শুনলেন, এই পদের অন্যতম প্রার্থী আইনস্টাইন তখন তিনি পদটি গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন। বললেন, এ পদের জন্য আইনস্টাইনের বিকল্প কেউ হতে পারেন না। অবশেষে আইনস্টাইন পদটি পেলেন। এপদে আইনস্টাইন কাজ করলেন খুব অল্পদিনই। দু'বছর বাদে ১৯১১ সালে তিনি যোগ দিলেন প্রাগের বিশ্ববিদ্যালয়ে। তত্ত্বীয় পদার্থবিদ্ হিসেবে। এতদিন পরে তিনি অধ্যাপকের পুরো বেতন

গেলেন। কারণ তিনি যখন জুরিখে যোগ দিয়েছিলেন তখন তিনি অধ্যাপকের পুরো বেতন পেতেন না। প্রাগের বিশ্ববিদ্যালয়ও আইনস্টাইনকে ধরে রাখতে পারলো না। মাত্র এক বছরের ব্যবধানে তিনি চাকুরী ছেড়ে দিলেন। ১৯১২ সালের গোড়ায় যোগ দিলেন জুরিখ পলিটেকনিকে।

॥ পাঁচ ॥

শুরু হয় আইনস্টাইনের জীবনের এক নতুন অধ্যায়।

অধ্যাপনার জীবন। তখন থেকে জীবনের প্রায় শেষ দিন পর্যন্ত তিনি অধ্যাপনা নিয়েই কাটিয়েছেন। জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন তিনি অধ্যাপক হয়ে এলেন তখন তাঁর দ্বিতীয় পুত্র এডুয়ার্ডের জন্ম হয়েছে। দুটি পুত্রের পরিচর্যা নিয়ে থাকতে হতো মিলেভাকে, অন্যদিকে মন দেবার অবসর ছিল না তাঁর। তাই তখন যদি কোনো দিন বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব নিয়ে স্বামী তাঁর সঙ্গে আলোচনা করতে চাইতেন, বিশেষ সাড়া পেতেন না। তবে কখনো কখনো স্বামী-স্ত্রী দু'জনকে সাংসারিক বিষয় নিয়ে, অর্থাৎ টাকা-পয়সা নিয়ে আলোচনা করতে দেখা যেত।

একদিন মিলেভা যখন রান্নার কাজে ব্যস্ত ছিলেন তখন আলবার্ট হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন—'আচ্ছা বলো তো আমরা কেন খরচ কুলোতে পারি না? পেটেন্ট অফিসে এই রকম মাইনেই তো পেতাম।'

—এখন যে আমাদের সংসার বড়ো হয়েছে। তা ছাড়া তুমি এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। এখন যে একটু ভালো পোশাক-পরিচ্ছদের দরকার আমাদের এবং অনেক অতিথি অভ্যাগতদের আপ্যায়ন করতে হয়। এই টাকায় কুলোবে কি করে?

—কিন্তু রোজগারটা বাড়াবো কি করে তা তো ভেবে পাচ্ছি না। আমার একটু প্র্যাকটিক্যাল হওয়া উচিত ছিল।

—তু' একটা বোর্ডার নিতে পারলে সমস্যার সমাধান হোত, বললেন মিলেভা একটা আলু কাটতে কাটতে।

আইনস্টাইন কথাটা চিন্তা করলেন, কিন্তু তাতে মিলেভার পরিশ্রম বাড়বে। এটা তাঁর কাম্য ছিল না। কিন্তু অবশেষে এটাই একমাত্র সমাধান বলে মনে হলো। পরে অবশ্য তিনি মাঝে মাঝে সুইজারল্যাণ্ডের বাইরে গিয়ে বক্তৃতা দিয়ে আয় বৃদ্ধির চেষ্টা করেছিলেন। এইভাবে একবার লিডেন বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা করতে গিয়ে তিনি খ্যাতনামা পদার্থবিদ হেনড্রিক লোরেকের আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন। জুরিখে থাকতেই তিনি প্রাগ (Prague) বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একটি আমন্ত্রণ-পত্র পেলেন। পত্রটি ছোট, কিন্তু বক্তব্য ছিল গুরুত্বপূর্ণ। 'প্রিয় প্রফেসর আইনস্টাইন, আপনাকে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক হিসাবে পেলে ধন্য হতাম !' বেতনের পরিমাণটা ছিল যেমন বেশি, পদটাও ছিল সম্মানের— পদার্থ বিভাগের প্রধান অধ্যাপক।

এই ঘটনা ১৯১১ সালের কথা। আইনস্টাইন সম্মতি জানালেন। আইনস্টাইনের কাছে অবশ্য সব চেয়ে আকর্ষণের বিষয় ছিল পদ বা বেতন নয়—কাজের স্বাধীনতা। এ বছরই আইনস্টাইন ব্রাসেল্‌স-এ গেলে। আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান কংগ্রেসে যোগ দিতে। এই অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা দিলেন বিজ্ঞানী আর্নস্ট সোল্‌ভে। এখানে আইনস্টাইনের সঙ্গে দেখা হয়েছিল বহু বিখ্যাত বিজ্ঞানীর। আইনস্টাইন আলাপ করেছিলেন স্যার আর্নেষ্ট রাদারফোর্ড, মাদামকুরী আঁরি পোঁয়াকারে, জাঁ পেরঁ্যা, পল লাভজন, নার্ণ্‌ষ্ট-এর বিজ্ঞানীদের সঙ্গে। প্রাগ বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বছর অধ্যাপনা করার পর তিনি জুরিখের পলিটেকনিক অ্যাকাডেমিতে যোগদান করেন ১৯১২ সালে। যোগদানের পর থেকে তিনি এখানে শুরু করলেন সাপ্তাহিক আলোচনা সভা। এই সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু ছাত্র শিক্ষক নিয়মিতভাবে যোগদান করতেন। তাঁরা সবাই

মিলে পদার্থ বিজ্ঞানের নানা নূতন কাজ নিয়ে আলোচনা করতেন। আইনস্টাইনের এই সাপ্তাহিক আলোচনা সভার সদস্য ছিলো প্রখ্যাত পদার্থ বিজ্ঞানী এরেনফেষ্ঠ। এই প্রখ্যাত বিজ্ঞানীর মৃত্যু হয় ১৯৩৩ সালে। মৃত্যুর সময় পর্যন্ত আইনস্টাইনের সঙ্গে এর বন্ধুত্ব ছিল গভীর। নানা কাজে এরা সারাজীবন পরস্পর উপকৃত হয়েছিলেন। মানুষের জীবনে যখন উন্নতি ও খ্যাতির দিন আসে তখন তা এইভাবেই একটার পর একটা আসতে থাকে।

তিনি যখন প্রাগ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিলেন তখন জর্জ পিক নামে তাঁর এক বন্ধুর মাধ্যমে আইনস্টাইন ওখানকার সংগীত শিল্পীদের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। তাঁর এই বন্ধুটি গণিতে যেমন ছিলেন পারঙ্গম তেমনি তিনি ছিলেন একজন সুদক্ষ বেহালাবাদক। বিজ্ঞান সাধনার পায়াপাশি চলতো সংগীতের সাধনা—মাধ্যাকর্ষণের জগৎ থেকে, আপেক্ষিকতাবাদের জগৎ থেকে সময় সময় তিনি চলে যেতেন সুরের জগতে। প্রাগের একাধিক সংগীত আসরে তাঁর বেহালা বাজানো শুনে শ্রোতাদের অনেকেই সবিস্ময়ে ভাবত—এ কেমন প্রতিভা যার মধ্যে এমন দুটি ভিন্নধর্মী বিষয়ের সমাবেশ ঘটেছে। এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রমহলে তিনি অল্পদিনের মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। একদিন ক্লাসে তিনি মহাকর্ষ (gravity) বোঝাচ্ছিলেন। লেকচার শেষ হয়ে গেলে ছাত্ররা তাঁর সামনে ভীড় করে এসে দাঁড়াল।

—স্যার, বাড়িতে কখন গেলে আপনার সঙ্গে কথা বলা যায়? জিজ্ঞাসা করে একটি ছাত্র।

—যে কোনো সময়ে আসতে পারো তোমরা।

—তাতে আপনার কাজের ব্যাঘাত ঘটবে না?

—তা একটু ঘটতে পারে। তবে তোমরা চলে গেলে তখন আমি গবেষণার কাজে আবার তন্ময় হয়ে যাব।

ছাত্ররা বিস্মিত হতো তাঁর মুখে এমন সহজ সরল উত্তর শুনে। এমন অধ্যাপকের সান্নিধ্যে তারা এর আগে কখন আসেনি।

জার্মান সম্রাট কাইজার বিজ্ঞান ও কারিগরী ক্ষেত্রে দেশকে উন্নত করার জন্য নিজের নামে কাইজার ভিলহেল্‌ম ইনস্‌স্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করেন। এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম প্রধান বিজ্ঞানী মাক্‌স প্লাঙ্ক ও নার্ণষ্ট সব সময়েই চেষ্টা করতেন সব রকম সুখ সুবিধে দিয়ে প্রখ্যাত বিজ্ঞানীদের এখানে আনা। এরা দুজনেই একদিন এসে হাজির হলেন আইনস্টাইনের কাছে। আসার উদ্দেশ্য তাঁরা আইনস্টাইনের কাছে তুলে ধরলেন। বললেন, আইনস্টাইন যদি কাইজার ভিলহেলম্ ইনস্‌স্টিটিউটে যোগ দেন তাহলে তাঁকে প্রুশিয় বিজ্ঞান একাডেমির সদস্য করা হবে। আর তিনিই হবেন প্রতিষ্ঠানটির অধ্যক্ষ। এই প্রস্তাব আইনস্টাইন ঠিক তখনই মেনে নিতে পারলেন না। বললেন, কিছুদিন পরে আপনারা আবার জুরিখে আসুন। তখন আমি আপনাদের কাছে আমার মতামত জানাব। তারপর রহস্য করে বললেন, যেদিন আপনারা আবার আসবেন, সেদিন যদি আমি লাল ফুলের গুচ্ছ নিয়ে আপনাদের অভ্যর্থনা জানাই, তবে বুঝবেন আমি কাইজার ভিনাহেল্‌ম ইনস্‌স্টিটিউটে যোগদান করব। তারপর কিছুদিন বাদে প্লাঙ্ক ও নার্ণষ্ট যখন আইনস্টাইনের মতামত জানতে জুরিখে এলেন তখন আইনস্টাইন তাঁদের লালফুল দিয়ে অভ্যর্থনা জানালেন। ১৯১৪ সালের ৬ই এপ্রিল তারিখে আইস্টাইন যোগ দিলেন কাইজার ভিলহেল্‌ম ইনস্‌স্টিটিউটে।

যোগদানের কয়েকমাসের মধ্যেই ১৯১৪ সালের পয়লা আগষ্ট তারিখে শুরু হল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। মুস্কিলে পড়লেন আইনস্টাইন। কারণ জার্মানীর প্রখ্যাত বিজ্ঞানীরা এক ইশতাহার প্রকাশ করে বললেন, "জার্মান সংস্কৃতি ও জার্মান সমরবাদ অচ্ছেদ্য"। এই দুর্ভাগ্যজনক ইশতাহারে স্বাক্ষর করেছিলেন মোট ৯৩ জন বিজ্ঞানী।

আইনস্টাইন এই ইশতাহারে স্বাক্ষর করলেন না। ফলে সহকর্মীদের সঙ্গে তাঁর মতান্তর উপস্থিত হলো। বার্লিনে থাকা অসহ্য হলো। তাছাড়া এই বার্লিনেই ঘটলো মিলেভার সঙ্গে তাঁর বিবাহ বিচ্ছেদ। ফেব্রুয়ারি মাসের ১৪ তারিখে।

১৯১৫ সালে আইনস্টাইন সুইজারল্যাণ্ডে চলে আসেন। যোগাযোগ হয় রম্যাঁ রল্যাঁর সঙ্গে। রঁল্যা তাঁর দিনলিপিতে সুন্দর-ভাবে তাঁদের সাক্ষাৎকারের বর্ণনা লিখে গেছেন। ১৯১৯ সালে আইনস্টাইন তাঁরই এক নিকট আত্মীয়া এলসা আইনস্টাইনকে বিয়ে করেন। ইনি ছিলেন তাঁর বিধবা খুড়তুতো বোন। ১৯৩৬ সালে তাঁর মৃত্যুর সময় পর্যন্ত এলসাই ছিলেন তাঁর জীবনসঙ্গিনী। মিলেভার মতো বিদুষী না হলেও স্বামীর পরিচর্যায় তিনি নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে দিয়েছিলেন। স্বামী যাতে নিশ্চিন্ত মনে বিজ্ঞানের সাধনায় আত্মনিয়োগ করতে পারে সেই দিকেই এলসার ছিল সদা সতর্ক দৃষ্টি, বলতে গেলে, সাংসারিক চিন্তা থেকে তিনি স্বামীকে মুক্তি দিয়েছিলেন। এলসার সেবা যত্নে আইনস্টাইনের জীবন সুখ ও শান্তিতে ভরে গিয়েছিল, একথা তিনি নিজেই বলেছিলেন। ছেলে দুটি মিলেভার কাছেই রয়ে গিয়েছিল এবং তিনি তাদের নিয়মিত খবরাখবর করতেন। বার্লিনে আইনস্টাইন-দম্পতির বাসস্থান ছিল পাঁচ নম্বর হ্যাবারল্যাণ্ড স্ট্রীটের পাঁচতলার একটি সুপরিসর ফ্ল্যাটে। এখানে যে ঘরটিতে বসে বিজ্ঞানী নিবিষ্টচিত্তে তাঁর গবেষণা নিয়ে থাকতেন সেটি বিজ্ঞানের বহুবিধ বই আর সাময়িক পত্র দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল। ঘরের এক কোণে ছিল মাথায় উইগ-পরা নিউটনের একটি আবক্ষ মর্মর মূর্তি। আর একটি কোণে ছিল একটি পিয়ানো এবং তার উপর একটি বেহালা। কিছুকাল থেকে এই যন্ত্রটি ছিল বিজ্ঞানীর চিরজীবনের সঙ্গী। এলসা গৃহকর্মে যেমন নিপুণা ছিলেন, তেমনি তিনি সুন্দর পিয়ানো বাজাতে পারতেন। স্বামীকে তিনি পিয়ানো বাজানো শিখিয়েছিলেন।

য়ুরোপে যখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয় তখন এই চিরশান্তিপ্রিয় মানুষটিকে রাজনীতির আসরে দেখা গিয়েছিল, অথবা বলা যায় যে, রাজনৈতিক আসরে নামতে তিনি বাধ্য হয়েছিলেন। যুদ্ধ-বিগ্রহ তিনি আদৌ পছন্দ করতেন না। তাঁর স্বভাবটাই ছিল এই রকম। যুদ্ধের দরুণ অন্যান্য সকলের মতো তাঁদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রাও বিঘ্নিত হয়েছিল। তাই এই সময়টা তিনি বই পড়েই অতিবাহিত করতেন। আইনস্টাইন কদাচিৎ উপন্যাসের ভক্ত ছিলেন। তবে একটি বই তাঁর খুব প্রিয় ছিল—সাঁর্ভাতের লেখা 'ডন কুইকসট'। এছাড়া তাঁর ভালো লাগত জীবনচরিত, প্রবন্ধ ও ইতিহাস—বিশেষ করে গ্রীকজাতির ইতিহাস। একদিন এলসাকে তিনি বলেছিলেন—'মাঝে মাঝে আমি ভাবি যে বিজ্ঞানের চেয়ে গ্রীকজাতির ইতিহাস খুবই উত্তেজনাপূর্ণ। সত্যি পৃথিবীব মধ্যে এই একটি জাতি যারা পৃথিবীর মানুষকে কত জিনিস দিয়ে গেছে।

যুদ্ধের সময়ে লার্ড, মাংস ও চিনি—প্রাত্যহিক প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলি দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠেছিল। একদিন মধ্যাহ্ন আহারের সময় প্লেটের উপর আলুর তৈরি প্যানকেক খেতে খেতে এলসাকে বলেন —'এর চেয়ে আঠা (glue) খেতে ভালো। কিন্তু, এলসা, আমি জানি, এ তোমার রান্নার দোষ নয়, জিনিসপত্রের দুষ্প্রাপ্যতাই এজন্য দায়ী।' মাঝে মাঝে এলসা অবশ্য স্বামীর জন্য চেষ্টাচরিত্র করে ভালো রান্নাবান্না করতেন, কিন্তু আইনস্টাইনের তখন ক্ষিধেই থাকত না। ছাত্রজীবনে অনেকদিন তাঁকে না খেয়ে বা কম খেয়ে কাটাতে হয়েছে ; এলসার এটা জানা ছিল। তাই স্বামীকে তিনি যখন খাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করতেন তখন বিষণ্ণতার সঙ্গে বিজ্ঞানীকে বলতে শোনা যেত—'সত্যি কথা বলতে আমার এখনকার মানসিক দুশ্চিন্তাটা হলো এই যুদ্ধের জন্য। মনে হয় সমস্ত য়ুরোপের ওপর ধ্বংসের একটা কালো বিভীষিকা নেমে এসেছে। দু'বছর তো হয়ে গেল, যুদ্ধ শেষ হওয়ার কোনো লক্ষণই দেখছি না।'

একমাত্র সুরের জগতে গিয়ে তিনি এই মানসিক অবসাদ বিস্মৃত হওয়ার চেষ্টা করতেন। সকালে কিছুক্ষণ পিয়ানোর কাছে বসতেন ; তারপর চলতো বেহালা বাজানো। একদিন পত্নীকে বললেন—'জানো, যে নিয়মে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড চলে সুরের জগৎ ঠিক সেই নিয়মেই চলে। মানুষের জীবনে সংগীত একটা শ্রেষ্ঠ সম্পদ, কি বলো তুমি ?'

এই বিষয়ে বিন্দুমাত্র বিতর্কের অবকাশ নেই। হেসে বলেন এলসা।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, যুদ্ধ বাধলে পর পরিবর্তিত পরিবেশ আইনস্টাইনকে প্রত্যক্ষ রাজনীতির আসরে টেনে এনেছিল। তিনি যুদ্ধ বিরোধী জনমত গঠনে সামিল হয়েছিলেন। তিনি তাঁর প্রচারে বলেছিলেন কেউ যেন সরকারী সৈন্যদলে যোগদান না করে। কিন্তু তাঁর এই আবেদন বিশেষ কার্যকরী হয়নি। যুদ্ধ-পরবর্তিকালে তিনি রাজনৈতিক চিন্তা-ভাবনা থেকে মুক্ত হতে পারেন নি এবং যে কোনো একটি পক্ষ অবলম্বন করতেন। হিংসা, ভীতিপ্রদর্শন, অবিচার অযথা আক্রমণ—এসব তিনি অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করতেন। প্রচণ্ডভাবেই ঘৃণা করতেন। ফ্যাসিবাদকে তিনি তাঁর অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করতেন এবং এইজন্যই পরবর্তিকালে হিটলারের জার্মানীতে তাঁর স্থান হয়নি। ১৯১৮ সালে যুদ্ধ শেষ হলো। ১৯১৯, ২৮ জুন ভার্সাই চুক্তি স্বাক্ষরিত হলো মিত্রশক্তি ও জার্মানির মধ্যে এই চুক্তির শর্তাবলী যখন খবরের কাগজে বেরুল তখন সমগ্র জার্মানিতে বিষাদের ছায়াপাত হলো। ভার্সাই সম্মেলনের আগেই সব রাষ্ট্রনায়কদের কাছে আইনস্টাইন ও তাঁর সমমতাবলম্বী একশ'জন বুদ্ধিজীবী শান্তির জন্য আবেদন করেছিলেন। জার্মানিকে কয়েকটি উপনিবেশ হারাতে হয় এবং যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রচুর অর্থ দাবী করা হয় জার্মানির কাছ থেকে। 'জার্মান জাতির মেরুদণ্ড ভেঙে দেওয়া হলো—এ ঘোরতর অবিচার।' সেদিন আইনস্টাইন এই মন্তব্য করেছিলেন।

অতঃপর আমরা আইনস্টাইনকে তাঁর গবেষণার কাজে আরো নিবিড়ভাবে আত্মনিয়োগ করতে দেখি। ১৯১৬ সালে তিনি যখন ইংরাজীতে তাঁর উদ্ভাবিত আপেক্ষিকতত্ত্বের ওপর প্রথম বইটি[১] প্রকাশ করেন তখন থেকেই প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীর বিজ্ঞানী মহলে এই বিষয়টি নিয়ে আলোড়ন সৃষ্টি হতে থাকে। এতকাল বিষয়টি জার্মানির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, কারণ এটি জার্মান ভাষাতেই লিপিবদ্ধ হয়েছিল। ১৯২০ সালে তিনি এই বিষয়ে দ্বিতীয় যে বইটি[২] ইংরেজি ভাষায় প্রকাশ করলেন সেইটিতে তিনি তাঁর বক্তব্যকে আরো পরিস্ফুট করলেন, ব্যাখ্যা করলেন এবং সুদৃঢ় গাণিতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন। প্রকৃতপক্ষে এই বইটি ছিল প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত কয়েকটি বক্তৃতার সমষ্টি। এই বছরেই য়ুরোপের জেনিভা শহরে স্থাপিত হয় 'লীগ অব নেশনস' যার উদ্দেশ্য ছিল পৃথিবীতে শান্তি চিরস্থায়ী করা।

১৯১৯, ২৯ মে।

বিজ্ঞান জগতের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় তারিখ। আইনস্টাইনের জীবনেও। এর ঠিক তিন বছর আগে তিনি প্রকাশ করেন তাঁর সাধারণ আপেক্ষবাদ (General Theory of Relativity)। তখন থেকেই মহাকর্ষতত্ত্ব সম্পর্কে নতুন ধারণার সূত্রপাত ঘটতে থাকে। সাধারণ আপেক্ষবাদের বিশ্লেষণে বিজ্ঞানী সমাজে বিস্ময়ের সৃষ্টি হয়। আলো সরল রেখায় চলে—এই ছিল নিউটনের কথা। কিন্তু আইনস্টাইন বললেন অন্য কথা—'ফোটন কণিকার সমষ্টি বলেই আলো আর সব শক্তির মতোই অভিকর্ষের নিয়ম মেনে চলে, তাই কোনো বিরাট গ্রহ বা নক্ষত্রের টানে আলোর গতি বেঁকে

১. General Theory of Relativity : Einstein.

২. The Meaning of Relativity And Relativity—The Special and General Theory : Einstein.

যাবে। প্রমাণ? স্যার অলিভার লজ প্রমুখ বিশিষ্ট বিজ্ঞানীরা সোচ্চার হয়ে উঠলেন। বিদ্রূপও করলেন। তখন আইনস্টাইন তাঁদেরকে বললেন—'সূর্যের কাছাকাছি অবস্থিত কোনো নক্ষত্রের ছবি তুলতে পারলে আমার এই উক্তির অভ্রান্ততা প্রমাণ হবে। পূর্ণগ্রাস সূর্য গ্রহণের সময় এই বক্রগতি দেখা যাবে।'

১৯১৯ সালের ২৯শে মে ছিল সূর্যের পূর্ণগ্রাসের দিন। পরীক্ষার উদ্দেশ্যে লণ্ডনের রয়্যাল অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটি ও রয়্যাল সোসাইটি, স্যার আর্থার এডিংটনের নেতৃত্বে উত্তর ব্রাজিলের সোব্রাল ও পশ্চিম আফ্রিকার কাছে প্রিন্সিপ দ্বীপে দুটি অভিযাত্রী দল পাঠালেন। ৩০২ সেকেণ্ডব্যাপী পূর্ণগ্রাসের ছবি তোলার ব্যবস্থা হলো। এই সব অভিযাত্রী দলে অন্যান্য বা যারা ছিলেন তারা হলেন, ই, টি নটিংহ্যাম, ডঃ এ, সি, ডি ক্রোমেলিন ও ডেভিডসন। এই অভিযানের প্রস্তুতি ও কার্য সম্পাদনের সময় লেগেছিল এক মাসের কিছু বেশী সময়। পরবর্তী কাহিনী সুপরিচিত। পূর্ণগ্রাসের আলোকচিত্র আইনস্টাইনের ভবিষ্যদ্বাণী প্রমাণিত করল। ৭ই নভেম্বর ১৯১৯ সালে এই ফলাফল সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বিখ্যাত পত্রিকা 'লণ্ডন টাইমস' লিখল: "নিউটনের ভাবনা চিন্তা বাতিল।" আইনস্টাইন বিশ্বজোড়া খ্যাতি পেলেন। সেই সঙ্গে সমস্ত পৃথিবী জানল, "তারার আলো সূর্যের মহাকর্ষে সত্যিই বেঁকে যায়।" রয়্যাল সোসাইটি তাঁকে অভিনন্দন জানালেন। সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে এই তরুণ জার্মান বিজ্ঞানীর নাম। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, বিপুল পরিমাণ যন্ত্রের সাহায্যে সেদিন বিজ্ঞানীরা যে তথ্যসংগ্রহ করেছিলেন, আইনস্টাইন তাঁর ঘরে বসেই শুধু পেন্সিল, কাগজ আর তাঁর কল্পনার সাহায্যে সেটি পেয়েছিলেন। সে জন্যেই বোধ হয় তাঁর এক জীবনীকার তাঁর সম্পর্কে এই মন্তব্যটি করেছেন—'সকলের আগে তিনি একজন কল্পনাকুশল চিন্তাবিদ্, তারপরে তিনি বিজ্ঞানী।'

১৯২১।

আইনস্টাইনের জীবনে আর একটি স্মরণীয় বৎসর।

পদার্থবিজ্ঞানে মৌলিক গবেষণার জন্য, একটি মৌলিক তত্ত্ব উদ্ভাবনের জন্য তিনি দুর্লভ নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। কিন্তু এই নোবেল পুরস্কার আইনস্টাইনকে বিচলিত করতে পারেনি। তিনি তাঁর "অবিচুয়ারিতে" এই পুরস্কারের কথা উল্লেখও করেন নি। প্রসঙ্গত, আইনস্টাইনের আরও একটি পুরস্কার পাওয়ার কাহিনী তোমাদের কাছে তুলে ধরছি। আইনস্টাইনের পুরস্কার পাওয়ার ঠিক তিন বছর আগে পদার্থ বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পান কোয়ানটামবাদের আবিষ্কর্তা ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক। এই ম্যাক্স প্ল্যাঙ্কের নামে তখন একটি পুরস্কার চালু করা করা হয়েছিল। প্রথম পুরস্কারের প্রাপক হিসেবে আইনস্টাইনকে মনোনীত করা হয়। পুরস্কার প্রদানের দিন সকাল থেকে আইনস্টাইন ব্যস্ত ছিলেন পড়াশুনো ও আলোচনা নিয়ে। হঠাৎ বিকেল বেলায় খেয়াল হলো তাঁকে পুরস্কার নিতে 'ইন্‌স্টিটিউট অব ফিজিক্‌স্'-এ যেতে হবে। আর গেলে তাকে কিছু বলতেও হবে। খানিকক্ষণ এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখলেন টেবিলের ওপর পড়ে রয়েছে জুতো কেনার একটি রসিদ। প্রায় মিনিট কুড়ি ছোট হস্তাক্ষরে তিনি লিখে হাজির হলেন সভায়। পড়তে আরম্ভ করলেন। দেখা গেল লেখাটি তাঁর সকালের আলোচনার বিষয়বস্তুর ওপর লেখা। এই সভার সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। তারপর সভাশেষে লেখাটি ও সোনার পদকটি (প্ল্যাঙ্কের মূর্তি খোদাই করা) দান করলেন তাঁর গৃহ চিকিৎসককে। যার সঙ্গে তিনি সকালে আলোচনায় বসেছিলেন।

১৯২১ সালেই স্থাপিত হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং তখন এখানে পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা ছাত্র সত্যেন্দ্রনাথ বসু যিনি পরবর্তিকালে পৃথিবীর তত্ত্বীয় বিজ্ঞানী মহলে 'প্রফেসার সত্যেন বোস' এই নামে

পরিচিত হন এবং যিনি তত্ত্বীয় বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ পুরোহিত আলবার্ট আইনস্টাইনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। প্রসঙ্গত সেই কাহিনী এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ করছি।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সত্যেন্দ্রনাথের সহপাঠি ছিলেন মেঘনাদ সাহা। ১৯১৫ সালে দুই বন্ধু এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন—মিশ্র-গণিতে প্রথম স্থান অধিকার করেন সত্যেন বোস আর ফলিত গণিতে প্রথম স্থান অধিকার করেন মেঘনাদ সাহা। দু'জনকেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বনামধন্য উপাচার্য স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সদ্য প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান কলেজে লেকচারারের পদে নিয়োগ করেন। পরে এঁরা দু'জনেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রীডার (Reader) হয়ে এখানে চলে আসেন। কলিকাতায় বিজ্ঞান কলেজে অধ্যাপনা কালেই সত্যেন্দ্রনাথ ও মেঘনাদ দু'জনে আইনস্টাইনের নাম ও তাঁর আবিষ্কারে কথা শুনেছিলেন এবং আপেক্ষিকতত্ত্বের প্রতি দু'জনেই আকৃষ্ট হয়েছিলেন। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকা কালেই সত্যেন্দ্রনাথ ইংরেজিতে আপেক্ষিকতত্ত্বের অনুবাদ করার জন্য আইনস্টাইনের সম্মতি চেয়ে তাঁকে বেনামে একটি পত্র লিখেছিলেন। তিনি সম্মতি দিয়েছিলেন। থিওরি অব রিলেটিভিটির প্রচারে ভারতবর্ষে এটাই ছিল প্রথম প্রয়াস। ১৯১৮ সালে দুই বন্ধু মিলে একটি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লণ্ডনের ফিলোজফিক্যাল ম্যাগাজিনে পাঠিয়েছিলেন এবং সেটি প্রকাশিত হয়েছিল।

১৯২৪ সালের গোড়ার দিকে ঐ পত্রিকাতেই সত্যেন্দ্রনাথ পদার্থ বিজ্ঞান সম্পর্কিত ছয় পৃষ্ঠার একটি প্রবন্ধ পাঠালেন। প্রবন্ধটির নাম ছিল "প্ল্যাঙ্ক সূত্র এবং কোয়ানটাম প্রকল্প"। অথচ এবার ঐ পত্রিকার সম্পাদক এই নিবন্ধটি প্রকাশ করতে যথেষ্ট বিলম্ব করেছিলেন। বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়ার ইতিহাসে দেখা যায় যে, অনেক সময় অনেকের মূল্যবান আবিষ্কার অন্যের নামের সঙ্গে যুক্ত

হয়েছে এবং যিনি প্রকৃত আবিষ্কর্তা তাঁর কথা জানবার কেউ সুযোগ পায় না। মনে মনে সেই রকম একটা আশংকা করেই সত্যেন্দ্রনাথ প্রায় একই সময়ে বার্লিনে আইনস্টাইনের কাছে ঐ নিবন্ধটির একটি প্রতিলিপি পাঠিয়েছিলেন এবং তাঁর অভিমত জানতে চেয়েছিলেন। ঐ সঙ্গে তিনি যে পত্রটি পাঠিয়েছিলেন তার ভাব ও ভঙ্গী দেখে আইনস্টাইন স্বয়ং মুগ্ধ হয়েছিলেন। এই চিঠিখানির তারিখ ৪ঠা জুন, ১৯২৪। এই চিঠির শেষে তরুণ বাঙালী অধ্যাপক লিখেছিলেন —'যদি আপনার বিবেচনায় এটি প্রকাশযোগ্য মনে হয় তাহলে আপনি 'য়্যানালস্ অব ফিজিকস্' পত্রিকায় এর প্রকাশের ব্যবস্থা করলে আমি আপনার কাছে যারপর নাই কৃতজ্ঞ থাকব। যদিও আমি আপনার কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত, তথাপি এই রকম অনুরোধ জানাতে আমি কিছুমাত্র সংকোচ বোধ করছি না। কারণ, আমরা সবাই আপনার ছাত্র।'

চিঠিখানি যথাসময়ে বার্লিনে আইনস্টাইনের হাতে পৌঁছল। পত্র লেখকের নাম তিনি ইতিপূর্বে শোনেননি এবং যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ঠিকানা দেওয়া ছিল তার নামও তিনি শোনেননি। কিন্তু চিঠিখানি পাঠ করে তিনি যতখানি মুগ্ধ হয়েছিলেন তার শতগুণ বিস্মিত হয়েছিলেন নিবন্ধটি পাঠ করে—মাত্র ছয় পৃষ্ঠার টাইপ-করা প্রবন্ধ। এর সারবত্তা ও গুরুত্ব উপলব্ধি করলেন তিনি। সেদিনকার বিজ্ঞান জগতে একমাত্র তিনি ভিন্ন বুঝবার মতো দ্বিতীয় তো আর কেউ ছিলেন না। অনুবাদ করলেন প্রবন্ধটি জার্মান ভাষায়, প্রকাশ করার জন্য পাঠিয়ে দিলেন উক্ত পত্রিকায়। শিষ্টাচারবশত পত্রপ্রেরকের কাছে আইনস্টাইনের স্বাক্ষরিত একটি উত্তরও যথাসময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে পৌছল।

পত্রের শেষে আইনস্টাইন লিখেছিলেন—'আপনার প্রবন্ধটি আমি আমার মাতৃভাষায় অনুবাদ করে 'য়্যানালস অফ ফিজিকস' পত্রিকায় পাঠিয়ে দিয়েছি যথাশীঘ্র প্রকাশ করার জন্য।...আপনার

নিবন্ধটির শেষে আমি আমার অভিমত হিসাবে এই দুটি লাইন সংযোজন করেছি—'আমার মতে প্লাঙ্ক সূত্র প্রমাণে বোসের এই পদ্ধতি একটা গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এখানে ব্যবহৃত পদ্ধতি আদর্শ গ্যাসের কোয়াণ্টামবাদে প্রযোজ্য, যা আমি অন্যত্র দেখাব।' আইনস্টাইন তাঁকে চিঠি লিখবেন, তাঁর প্রবন্ধটি জার্মান ভাষায় অনুবাদ করে প্রকাশ করবেন, সত্যেন্দ্রনাথ এতটা প্রত্যাশা করেন নি। 'আমি এই মহাবিজ্ঞানীর মনের এই রকম উদারতা দেখে যারপর নাই মুগ্ধ হয়েছিলাম।' পরবর্তী কালে এই কথা বলতেন সত্যেন্দ্রনাথ। এর পরেই সত্যেন্দ্রনাথ ১৯২৪ সালের আগস্ট মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দু'বছরের ছুটি নিয়ে য়ুরোপ যাত্রা করেন এবং নভেম্বর মাসের কোনো এক সময়ে বার্লিনে গিয়ে আইনস্টাইনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। শুধু কি মামুলি সাক্ষাৎ? তাঁর অধীনে কাজ করবার সুযোগ সুবিধাও তিনি পেয়েছিলেন। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বিশেষ প্রতিভাবান গবেষক ভিন্ন তাঁর কাছে গবেষণা করবার অধিকার লাভ খুব সুলভ ছিল না। 'বার্লিনে এসেই হোটেল থেকে টেলিফোনে যোগাযোগ করি আইনস্টাইনের সঙ্গে। তাঁর কথায় আন্তরিকতার স্পর্শ ছিল। তিনি আমাকে ডেকে পাঠালেন। সেই থেকে আমাদের দু'জনের মধ্যে স্থাপিত হয় গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক আর এই সম্পর্ক অটুট ছিল তাঁর মৃত্যুকাল অবধি।'—এই কথা বলতেন অধ্যাপক বোস।

১৯২১ সালে আইনস্টাইন পত্নী এলসাকে সঙ্গে নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইংলণ্ড ভ্রমণে বেরুলেন। নিউইয়র্ক শহরের রাস্তায় তাঁকে দেখবার জন্য জনতার যে সমাগম হয়েছিল তা ঐ শহরের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে। তার এই ভ্রমণের একটা বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। ইহুদীদের জন্য একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হবে। এজন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন ছিল। আমেরিকায় প্রচুর বিত্তশালী ইহুদীর বাস। আইনস্টাইন আমেরিকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে লেকচার দিয়ে যে

অর্থ উপায় করেছিলেন তাঁর স্বজাতীয়দের কল্যাণে এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য সেই অর্থ দান করেছিলেন। সমগ্র ইহুদী সমাজের পক্ষ থেকে সেদিন এই বিজ্ঞানীকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা নিবেদন করা হয়েছিল। এখানে উল্লেখ্য যে, তাঁর এই ভ্রমণের অন্যতম সঙ্গী ছিলেন জাইওনিস্ট[১] নেতা এবং ইংলণ্ডের বিখ্যাত ইহুদী রসায়নবিদ ডক্টর ওয়াইজম্যান। আমেরিকা সফর শেষ করে তিনি ইংলণ্ডে এসেছিলেন এবং এখানেও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ঐ একই উদ্দেশ্যে বক্তৃতা প্রদান করেন। তাঁর প্রত্যেকটি বক্তৃতার মধ্যে সাধারণ বিষয়ের সঙ্গে তাঁর আপেক্ষিকতত্ত্বের উল্লেখ থাকত—থাকত আরো নানারকম বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গ সেগুলি তাঁরই চিন্তা-ভাবনার মধ্যে জন্ম নিয়েছিল। বিদেশে তাঁর সম্বর্ধনা ও খ্যাতির বহর দেখে এলসা যারপর নাই বিস্মিত হয়েছিলেন।

অভ্যর্থনা, অভিনন্দন ও ভোজসভার যেন বিরাম ছিল না। আমেরিকার প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয় যেদিন আইনস্টাইনকে সম্মানিত 'ডক্টর অব সায়ান্স' (D.Sc.) উপাধিতে ভূষিত করলেন, সমসাময়িক বিবরণ থেকে জানা যায় যে, সেদিন ঐ অনুষ্ঠানে আমেরিকার প্রখ্যাত বিজ্ঞানীরা সদলে উপস্থিত ছিলেন। উপাধি পত্র প্রদান করার সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য জার্মান ভাষায় যখন তাঁদের বরেণ্য অতিথিকে স্বাগত জানিয়ে বললেন—'We salute the new Columbus of Science voyaging through the strange seas of thought alone.' ('চিন্তার বিচিত্র সমুদ্রে একাকী পাড়ি দেবার জন্য আমরা বিজ্ঞানের এই নবীন কলম্বাসকে অভিবাদন করি।')—তখন সেই অনুষ্ঠান-সভায় বিপুল হর্ষধ্বনি উঠেছিল। আইনস্টাইন আমেরিকার নর-নারীর চিত্ত জয়

---

১. ইহুদী সম্প্রদায়ের যাঁরা নিজেদের জন্য একটি স্বতন্ত্র স্বাধীন দেশ গড়ে তুলতে বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন, তাঁদেরকে বলা হতো জাইওনিস্ট (Zionist)। ডঃ ওয়াইজম্যান (Weizman) তখন এদের প্রধান মুখপাত্র ছিলেন।

করতে পেরেছিলেন। তাঁরা যখন ঐ দেশ থেকে বিদায় নিয়ে ইংলণ্ড অভিমুখে যাত্রা করেন তখন নিউইয়র্ক টাইমস পত্রিকায় এই মন্তব্যটি করা হয়েছিল—'He has captivated Americans by his kindliness and obvious sincerity.' এর থেকেই বোঝা যায় মানুষ হিসাবে তিনি কত বড়ো ছিলেন।

১৪ই মার্চ, ১৯২৯ সাল। মহাসমারোহে আইনস্টাইনের পঞ্চাশতম জন্মদিন পালিত হল। দেশ বিদেশের বহু বিজ্ঞানী আইনস্টাইনকে অভিনন্দন জানালেন। দেশের সাধারণ মানুষও বাদ গেলেন না, তাঁর জন্মদিনে জার্মানীর চ্যান্সেলার অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। আবার একজন শ্রমিকও তাকে নিজস্ব সাধ্যানুসারে উপহার পাঠিয়েছিলেন।

এই বিজ্ঞানীর অন্তঃকরণটা যে কতখানি কোমল এবং সহৃদয়পূর্ণ ছিল তার বহু দৃষ্টান্তই তাঁর জীবনে পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু এখানে যেটির উল্লেখ করছি তারই মধ্যে সমবেদনায় ভরা যে মানুষটিকে আমরা দেখতে পাই তা এক কথায় অতুলনীয়; রূপালী পর্দার বিশ্ববিশ্রুত শিল্পী চার্লি চ্যাপলিন তাঁর আত্মচরিতে এই ঘটনাটির উল্লেখ করেছেন। ১৯৩১ সালে চ্যাপলিনের পূর্ণাঙ্গ নির্বাক চিত্র 'সিটি লাইটস' যখন মুক্তিপ্রাপ্ত হয় তখন তিনি ছবিটি দেখার জন্য আইনস্টাইনকে বিশেষভাবে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। এই কৌতুক চিত্রটিতে দরিদ্রদের ভাগ্য অতি মর্মান্তিকভাবে প্রদর্শিত হয়েছে। চ্যাপলিন লিখেছেন, 'ছবিটির যখন শেষ দৃশ্যটি পর্দায় দেখান হচ্ছিল তখন আমি হঠাৎ আইস্টাইনের দিকে মুখ ফিরিয়ে দেখি যে রুমাল দিয়ে তিনি তাঁর চোখ দুটি মুছছেন। এর থেকেই প্রমাণিত হয় যে, বিজ্ঞানীরা প্রকৃতপক্ষে incurable sentimentalists—তাঁদের হৃদয় সত্যিই কোমলতায় পূর্ণ।' তেমনি আততায়ীর গুলিতে মহাত্মাগান্ধী যখন নিহত হয়েছিলেন সেই দুঃসংবাদে যারপরনাই বিচলিত হয়ে আইনস্টাইন এই সুন্দর উক্তিটি

করেছিলেন: 'ভবিষ্যৎ বংশীয়েরা বিশ্বাসই করবে না যে, এই পৃথিবীতে রক্ত-মাংসের শরীরে এই রকম একজন মহামানব বিদ্যমান ছিলেন।'

আমেরিকা সফর শেষ করে ইংলণ্ডে এলেন আইনস্টাইন। এখানেও তাঁর জন্য বিপুল অভ্যর্থনা অপেক্ষা করছিল। যুদ্ধের শুরু থেকেই একটা জার্মান-বিরোধী মনোভাব ইংলণ্ডের নর-নারীর মনে তখন তীব্র হয়ে উঠেছিল। কিন্তু আইনস্টাইন সম্পর্কে তাদের মনে ছিল পরম শ্রদ্ধার ভাব। তখন ইংলণ্ডের যুদ্ধমন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন লর্ড হ্যালডেন। তিনি স্বয়ং জাহাজঘাটায় এসে এই বিজ্ঞানীপ্রবরকে তাঁর দেশের পক্ষ থেকে সানুরাগ অভ্যর্থনা জানালেন এবং কয়েকটি বক্তৃতা দেবার জন্য তাঁকে অনুরোধ করলেন। কিংস কলেজে একটি বক্তৃতা অনুষ্ঠানে সমবেত শ্রোতাদের কাছে আইনস্টাইনকে পরিচিত করিয়ে দেবার সময়ে লর্ড হ্যালডেন এই উক্তিটি করেছিলেন—What Newton was to the eighteenth century, Einstein is to the twentieth.' (অর্থাৎ, 'অষ্টাদশ শতকে নিউটন যা ছিলেন, বিংশ শতকে ঠিক তাই হলেন আইনস্টাইন।') সেদিনের সভায় বিদগ্ধমণ্ডলীর সামনে এই জার্মান বিজ্ঞানী যে ভাষায় ইংলণ্ডের স্যর আইজাক নিউটনের স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেছিলেন তা শুনে সকলেই আইনস্টাইনের উদারতার প্রশংসা করেছিলেন। প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জ, প্রখ্যাত নাট্যকার জর্জ বার্নার্ড শ প্রমুখ সকলেই আইনস্টাইনের প্রতি আন্তরিক সৌজন্য প্রদর্শন করেছিলেন।

ইংলণ্ডের পর তিনি এলেন ফ্রান্সে। যুদ্ধের ক্ষতচিহ্ন তখনো পর্যন্ত ফ্রান্সের সর্বাঙ্গে। তথাপি এই বিজ্ঞানীশ্রেষ্ঠকে ফ্রান্স বিপুল সম্মান ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছিল। শান্তিবাদী এই মানুষটি সহজেই ফরাসীর বিদগ্ধ নর-নারীর চিত্ত জয় করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর

উদ্ভাবিত যুগান্তকারী আপেক্ষিকতত্ত্ব যতটা না হোক তার চেয়ে বেশি তাঁর চারিত্রিক মহত্ত্বই সেদিন আইনস্টাইনকে ফরাসীর প্রত্যেকটি নাগরিকের কাছে পরম শ্রদ্ধার পাত্র করে তুলেছিল। যুদ্ধ-পরবর্তী ফরাসী দেশের চেহারা দেখে বিজ্ঞানীর মন যেন দুঃখে ও সমবেদনায় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছিল। বিজ্ঞানচর্চার জন্য সমগ্র য়ুরোপে এই দেশের খ্যাতি বড় কম ছিল না। এখানে আসার পরেই একটি ঘরোয়া বৈঠকে তিনি সমকালীন ফরাসী বিজ্ঞানীদের সঙ্গে মিলিত হয়ে খুব আনন্দলাভ করেছিলেন। সেই বৈঠকে যাঁরা সমবেত হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন বিশেষভাবে আইনস্টাইনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। তিনি বিশ্ববন্দিতা মাদাম ক্যুরি (১৮৬৭-১৯৩৪) যাঁর রেডিয়াম আবিষ্কার (স্বামী পিয়ারে ক্যুরির সহযোগিতায়) বিজ্ঞান-জগতের একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা হিসাবে গণ্য হয়ে থাকে।

সাধারণ পরিচ্ছদে সজ্জিতা মাদাম ক্যুরিকে দেখে আইনস্টাইনের মনে হলো কী ক্লান্তিতে ভরা মহিলার চোখ দুটি আর রেডিয়াম গবেষণার চিহ্ন রয়ে গেছে তাঁর হাতের তালু দুটিতে। স্বভাব-গম্ভীর পোল্যাণ্ডের এই বিদুষী দুহিতার প্রতিভা ও সাহসের অকুণ্ঠ প্রশংসা করলেন তিনি। পরিষ্কার ফরাসী ভাষায় আলাপ হয় দু'জনের মধ্যে। হাস্য-পরিহাসপ্রিয় আইনস্টাইনের সান্নিধ্যে আসার পর তাঁর পক্ষে গাম্ভীর্য বজায় রাখা কঠিন হয়েছিল। 'জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে পৃথিবীর সকল মানুষের জীবন সুখ ও শান্তিতে ভরে উঠবে, আজীবন আমি মনের মধ্যে এই আশা পোষণ করে এসেছি' —বিজ্ঞানীর মুখে এই কথা শুনে মাদাম ক্যুরি প্রমুখ ফরাসীদেশের বিজ্ঞানী সমাজ আইনস্টাইনের প্রতি গভীর ভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তাঁর বিদায়ের কালে ফরাসী সংবাদপত্র একযোগে তাঁর প্রতি যে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেছিল তা ঐদেশের সংবাদপত্র জগতের ইতিহাসে আজো স্মরণীয় হয়ে আছে।

এবার দূরপ্রাচ্য থেকে আমন্ত্রণ আসে। আমন্ত্রণ আসে সারা

পৃথিবী থেকেই। সমসাময়িক বিবরণ থেকে জানা যায় যে, তখন এই জার্মান বিজ্ঞানীর খ্যাতির যেন সীমা-পরিসীমা ছিল না। 'এ এক আশ্চর্য বিড়ম্বনা আমার জীবনে।'—এই কথা যখন তিনি একদিন এলসাকে বলছিলেন তখন স্ত্রীর কাছ থেকে তিনি এই উত্তরটি পেয়েছিলেন—'পৃথিবীর খ্যাতিমানদের জীবন থেকে তোমার জীবন যে ব্যতিক্রম হতে পারে না, এ তো সুনিশ্চিত।' ১৯২২ সালের শরৎকালে চীন ও সাংহাই সফর শেষ করে তাঁরা এলেন জাপানে। এখানে কোবে বন্দরে পদার্পণ করার পর পর্বতমালা পরিশোভিত চারদিকের রমণীয় দৃশ্য আইনস্টাইনকে মুগ্ধ করলো। রাজা-রাজড়ার তুল্য অভ্যর্থনা পেয়েছিলেন তিনি জাপানে। তাঁর কণ্ঠস্বর, তাঁর ব্যবহার আইনস্টাইনকে সেদিন জাপানের বিদগ্ধ সমাজের কাছে পরম প্রিয় করে তুলেছিল। প্রত্যেকটি আলোচনা বৈঠকে ও বক্তৃতা সভায় প্রচুর লোক সমাগম হতো এবং যদিও তিনি জার্মান ভাষায় কথা বলতেন তথাপি শ্রোতাদের তা শুনতে আগ্রহের অন্ত ছিল না। জাপানের কতো প্রতিষ্ঠান থেকে কত রকমের উপঢৌকন যে তিনি লাভ করেছিলেন তার সীমাসংখ্যা ছিল না।

জাপান ভ্রমণ শেষে যখন তারা বার্লিন যাত্রার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন তখন সংবাদ এলো যে সুইডিস বিজ্ঞান পরিষদ কর্তৃক প্রতি বছর যে পুরস্কার দেওয়া হয়ে থাকে এবার (১৯২১) পদার্থ বিজ্ঞানে সেই দুর্লভ সম্মান—নোবেল প্রাইজ—আইনস্টাইন লাভ করেছেন। এই অপ্রত্যাশিত সংবাদটি জানার পরক্ষণেই এলসা তাঁর স্বামীকে বলেছিলেন 'তোমার আপেক্ষবাদের এর চেয়ে বড় স্বীকৃতি আর কিছু হতে পারে না।'

—ভুল বলছ। আমাকে এই পুরস্কার দেওয়া হয়েছে এজন্য নয়; বার্নে অবস্থানকালে 'The Quantam Law of the

Absorption of Light' নামে যে তথ্যটি প্রকাশ করেছিলাম তারই জন্য এই পুরস্কার।

—কিন্তু আপেক্ষবাদই তো তোমাকে পৃথিবীতে খ্যাতিমান করে তুলেছে। তোমাকে সুইডেন গিয়ে এই পুরস্কার আনতে হবে ওখানকার রাজার হাত থেকে।

—তাই নাকি? সে তো আর এক বিড়ম্বনা।

—বক্তৃতা দিতে হবে।

১৯২২, জুলাই। সুইডেনে যাওয়া ঠিক হলো। এই সময় একদিন তাঁর এক সতীর্থ তাঁর বার্লিনের বাসভবনে এসে আইনস্টাইনকে বললেন—'এবার একটা দামী নতুন ড্রেস স্যুট দরকার হবে তোমার।'

—যে পরিচ্ছদে আমি সর্বত্র বক্তৃতা দিয়ে থাকি সেটাই তো যথেষ্ট।

—না, আলবার্ট। অনেক খ্যাতনামাদের সমাবেশ ঘটবে সেখানে, স্বয়ং সুইডেনের রাজা আসবেন। নতুন একটা পরিচ্ছদ বানাতেই হবে।

—জানো এলসা মানুষের মূল্য তার অন্তরের সম্পদের জন্য, বাহ্যিক আড়ম্বরের জন্য নয়।

কিন্তু পত্নীর মুখ-চোখের ভাব দেখে আইনস্টাইনের মনে হলো দার্শনিক ভাবপূর্ণ এই কথাটি বোধ হয় এলসার মনঃপূত হয় নি। তখন তিনি বললেন—পুরানো যে পোশাকটা আছে এটাই বেশ ঝেড়ে মুছে নিলেই চলবে।

এই আড়ম্বরহীনতাই এই বিজ্ঞানীর চরিত্রকে এক সুমহৎ ব্যঞ্জনায় মণ্ডিত করেছে। নোবেল প্রাইজ গ্রহণের অনুষ্ঠানে সমবেত সকলে তাঁর বক্তৃতাই[১] শুনছিল তন্ময়চিত্তে, তিনি কি রকম পরিচ্ছদ ধারণ করেছিলেন সে দিকে কারো লক্ষ্যই ছিল না। নোবেল প্রাইজের

১. বক্তৃতাটি পরিশিষ্ট (ক)-তে দ্রষ্টব্য।

পঞ্চাশ হাজার ডলারের মধ্যে অর্ধেক তিনি সুইডেনের একটি অনাথ আশ্রমে দান করেন আর বাকী অর্ধেকটা তাঁর ছেলে দুটির লেখা-পড়ার জন্য প্রথমা পত্নী মিলেভাকে দিয়েছিলেন। বলা বাহুল্য, এলসা এতে বিন্দুমাত্র আপত্তি করেন নি।

এখানে উল্লেখ্য যে, তাঁর নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তিতে ভারতীয় বিজ্ঞানী সমাজ আনন্দিত হয়েছিল। এঁদের মধ্যে বিশিষ্ট বাঙালী বিজ্ঞানী—মেঘনাদ সাহা—আইনস্টাইন প্রতিভার একটি সুন্দর মূল্যায়ন করেছিলেন সেই সময়ে।[২]

---

২. ঐ মূল্যায়নটি পরিশিষ্ট (গ -তে দ্রষ্টব্য।

॥ ছয় ॥

বিজ্ঞানী আইনস্টাইন সত্যিই ছিলেন একজন মানবদরদী। এরই একটা দৃষ্টান্ত উল্লেখ করি। সুইজারল্যাণ্ডে আল্পস পর্বত-মালার সন্নিকটে ডাভোস নামক একটি স্থানে একটি স্বাস্থ্যনিবাস (Sanatorium) স্থাপিত হবে। সূর্যালোক ও তাজা বাতাস অল্প-বয়স্ক রোগীদের মনকে সহজেই উজ্জীবিত করে থাকে। প্রস্তাবিত স্বাস্থ্যনিবাসটির পক্ষে ডাভোসের পরিবেশ উপযুক্ত ছিল। উদ্যোক্তারা আইনস্টাইনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে যখন তাঁদের এই পরিকল্পনার কথা জানালেন তখন তিনি এটি সমর্থন করেন।

—এ জন্য তো প্রচুর টাকার দরকার।

—আজ্ঞে হ্যাঁ। সেই অর্থ সংগ্রহে আমাদের সাহায্য করার জন্য আপনাকে অনুরোধ করতে এসেছি।

—কি করতে হবে আমাকে?

—যে জায়গায় আমরা এই স্বাস্থ্যনিবাস স্থাপন করব সেইখানে গিয়ে আপনি যদি গোটা কতক বক্তৃতা দেন—

—সে তো আল্পস্ এর ওপর। আমাকে সেখানে যেতে হবে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, একটু কষ্ট করে যদি—

আর বলতে হলো না। আইনস্টাইন তাঁর সম্মতি দিলেন। ১৯২৮ সালে দুরারোহ আল্পস্ পর্বতমালা আরোহণ করে তিনি

কয়েকটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। টিকিট কিনে এই বক্তৃতা শুনতে প্রচুর দর্শক সমাগম হয়েছিল। উদ্যোক্তারা জানালেন বিজ্ঞানীকে তাঁদের অন্তরের অজস্র ধন্যবাদ। কিন্তু অত উঁচুতে উঠতে গিয়ে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন ; সেই অবস্থাতেই বক্তৃতা প্রদান করেন। ফিরবার সময় হঠাৎ তিনি হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হলেন। তখন তাঁর বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। চিকিৎসকগণ তাঁকে নিচে নামিয়ে এনে জুরিচের একটি হাসপাতালে চিকিৎসার ব্যবস্থা করলেন। আইনস্টাইনের অসুস্থতার সংবাদ তাঁর পত্নী এলসার নিকট প্রেরিত হলো।

—এ কিছু না ; একটু বিশ্রাম নিলেই ঠিক হয়ে যাবে।

কিন্তু এলসা লক্ষ্য করলেন এই কয়টি কথা বলতে গিয়ে স্বামী যেন ক্লান্ত বোধ করছেন। এলসার উদ্বেগের সীমা নেই। সমসাময়িক বিবরণ থেকে জানা যায় যে, আইনস্টাইনকে কয়েক সপ্তাহ হাসপাতালে অতিবাহিত করতে হয়েছিল। দুশ্চিন্তার মধ্যেই কেটেছিল এই দিনগুলি। চিকিৎসকদের নির্দেশে রোগীর নড়া-চড়া একদম নিষেধ ছিল। হাসপাতালের শয্যায় শায়িত স্বামীকে এলসা নিজের হাতে খাইয়ে দিতেন—দিতেন উৎসাহ। স্ত্রীর সেবা-পরিচর্যার আন্তরিকতা দেখে বিজ্ঞানী মুগ্ধ হয়েছিলেন।

—না তোমাকে নিয়ে পারা যাবে না, তোমার ওপর সর্বক্ষণ নজর রাখতে হবে। একদিন মৃদু ভর্ৎসনার ভঙ্গিতে বলেন এলসা তাঁর অসুস্থ স্বামীকে যখন তিনি দেখতে পেলেন যে, হাসপাতালের শয্যার ওপর অর্ধশায়িত অবস্থাতেই তিনি একটি প্যাডের ওপর একমনে অঙ্ক কষে চলেছেন।

—অসুখ তো সেরে গেছে আমার ; বুকের মধ্যে সেই জমাট ভাবটা এখন আর নেই।

গোটা বছরটাই অসুস্থতার মধ্যে কেটেছিল তাঁর। তারপর শরীরে জোর পেয়েছিলেন তিনি। ১৯২৯ সালে প্রাশিয়ান অ্যাকাডেমিতে আইনস্টাইন চব্বিশ পৃষ্ঠার একটি নিবন্ধ পাঠিয়ে-

ছিলেন। একই শক্তি মহাজাগতিক নিয়ন্ত্রণে দিকে দিগন্তরে নানা ব্যঞ্জনায় নিত্য প্রকাশিত। এই সত্য দিয়েই রচিত হয়েছিল আলবার্ট আইনস্টাইনের 'একক শক্তি তত্ত্ব' বা 'একীভূত ক্ষেত্র তত্ত্ব' যার ইংরেজী নাম 'ইউনিফায়েড ফিল্ড থিওরী' (Unified Field Theory)। ঐ নিবন্ধে তিনি মহাকর্ষের ভৌত নিয়মগুলির সঙ্গে তড়িৎ-চৌম্বকীয় তত্ত্বকে একত্রিত করেন। প্রখ্যাত গাণিতিক ডঃ ওয়াল্টার মেয়ারের সঙ্গে তিনি এই বিষয়টি নিয়ে প্রথম আলোচনা করেছিলেন। আলোর প্রকৃতি ও রেডিয়ামের ব্যবহার-বিধি—এই সমস্যা, আইনস্টাইন বলেছেন, তাঁর উদ্ভাসিত তত্ত্ব দ্বারা সমাধান করা যাবে। এই তত্ত্বের ভিত্তি ছিল একটি মাত্র গাণিতিক ফরমুলা—যদিও সেটি তখনো পর্যন্ত সম্পূর্ণ রূপ পায়নি। এই তত্ত্বের উদ্ভাবনে তিনি আংশিক সাফল্যলাভ করেছিলেন।

নিবন্ধটি পাওয়ার পর প্রাশিয়ান অ্যাকাডেমি সেটি প্রচারের ব্যবস্থা করলেন। আইনস্টাইন উদ্ভাবিত এই নতুন তত্ত্বটির আলোকচিত্র (photostat) সাংবাদিকদের দেওয়া হলো। লণ্ডন থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বেতার ফটো প্রেরিত হলো। এক দেশ থেকে সমুদ্র পারে অন্য একটি দেশে সেই প্রথম বেতারে একটি গাণিতিক ফরমূলা প্রচারিত হয়েছিল। আলবার্ট আইনস্টাইন আবার পৃথিবীর বিজ্ঞানী সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। আবার তাঁকে খ্যাতির বিড়ম্বনার সম্মুখীন হতে হয়। ছবি আঁকিয়েরা তাঁর বাসস্থানে হানা দিতে থাকেন। তাদের সকলের মুখে একটি মাত্র অনুরোধ—'স্যার একটু স্থির হয়ে বসবেন। আপনার একটা স্কেচ করব।' চলচ্চিত্রের দিকপালেরা তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে, রূপালি পর্দার সামনে একটু দাঁড়াবার জন্য অনুরোধ করেন ও এজন্য তাঁরা তাঁকে প্রচুর টাকা দিতে সম্মত ছিলেন। একজন প্রযোজক বললেন—'আপনাকে কিছুই করতে হবে না। একটি চক খড়ি হাতে নিয়ে আপনি শুধু একবার ব্ল্যাকবোর্ডের সামনে দাঁড়াবেন।'

—আমাকে এরা কি মনে করে—একটা খেলোয়াড় বাঁদর? এলসাকে একদিন এই কথা বলেছিলেন তিনি। অর্থের প্রলোভন তিনি এইভাবেই উপেক্ষা করেছিলেন।

১৯২৯, মার্চ ১৪।

আইনস্টাইন পঞ্চাশ বছরে পদার্পণ করলেন।

তাঁর এই জন্মদিনকে উপলক্ষ্য করে বার্লিনে একাধিক অনুষ্ঠান হবে এবং তাঁকে সেইসব অনুষ্ঠানে যোগদান করতে হবে—এটা অনুমান করেই আইনস্টাইন জন্মদিনের পনর দিন আগেই বার্লিন পরিত্যাগ করবেন ঠিক করেছিলেন। ফ্রানজ্‌লেম নামে একজন প্রখ্যাত শিল্পপতি ছিলেন। এর কারখানায় জুতোর পালিশ তৈরি হতো—তিনি ছিলেন জার্মানীর অদ্বিতীয় 'shoe polish king'। আইনস্টাইন-প্রতিভার একজন অনুরাগী ছিলেন তিনি। হ্যাডেল নদীর ধারে তাঁর ছিল একটা বিরাট এস্টেট। সেইখানে তিনি একটি নির্জন বাগানবাড়ি তৈরি করিয়েছিলেন ও সেটি তিনি বিজ্ঞানীকে তাঁর প্রয়োজনমত অবসর যাপনের জন্য ব্যবহার করতে দিয়েছিলেন।

জন্মদিনের বিড়ম্বনা এড়াবার জন্য তিনি কিছুকাল এইখানেই একাকী যাপন করেন। বেহালা বাজিয়ে নৌকো চড়ে আর নিজের হাতে রেঁধে তিনি এই নির্জন অবসরের দিনগুলি যাপন করতেন। আবার এরই ফাঁকে চলতো গবেষণার কাজ। একদিন সকালে তিনি এলসাকে ফোন করে বলেন যে, গাণিতিক হিসাবে একটি ভুল বেরিয়েছে। 'আমার সহকারীকে একবার ডেকে দেবে?'

—কিন্তু আজ যে তোমার জন্মদিন।

—এ নিয়ে হৈ-চৈ করার দরকার নেই।

বিজ্ঞানী ভুলেই গিয়েছিলেন সেদিন তাঁর জন্মদিন। কিছুদিন বাদে বার্লিনে তাঁর বাসভবনে ফিরে এসে জন্মদিন উপলক্ষ্যে প্রেরিত স্তূপীকৃত উপহার দ্রব্য দেখে তিনি রীতিমতো বিস্মিত হলেন। সারা

পৃথিবীর সকল শ্রেণীর মানুষের কাছ থেকে এসেছে শুভেচ্ছাবাণী। দিনমজুর, বিজ্ঞানী ও ছাত্রদের কাছ থেকেও। ঐ শুভেচ্ছা জানিয়েছেন তাঁকে জার্মানীর চ্যান্সেলর, স্পেনের রাজা এবং জাপানের সম্রাট। উপহার দ্রব্যগুলির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল একটি অ্যালবাম। আমেরিকার জাইওনিস্ট সমিতি ও ইহুদী জাতীয় তহবিল সমিতি থেকে এটি প্রেরিত হয়েছিল। অ্যালবামটিতে যেসব বিশিষ্ট ব্যক্তির স্বাক্ষর ছিল তাঁদের প্রত্যেকেই প্যালেস্টাইনে জমি কিনে সেখানে বৃক্ষরোপণ করার জন্য একশত ডলার করে দান করেছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি হার্বার্ট হুভার সেই অ্যালবামটির উপর তাঁর স্বাক্ষর প্রদান করে এই কয়টি কথা লিখে দিয়েছিলেন—'Professor Einstein ranks high among the foremost scientists of all time who have enriched mankind by their valuable contributions to thought and human progress.'

এই কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। তারই চিন্তার মূল্যবান অবদানে মানবজাতি সর্বকালের জন্য সমৃদ্ধ হয়েছে। তাঁর এই জন্মদিন উপলক্ষ্যে বার্লিনবাসীদের প্রদত্ত চাঁদায় আইনস্টাইনের যে আবক্ষ ব্রোঞ্জ মূর্তিটি নির্মিত হয়েছিল সেটি পটাসডামের এ্যাস্ট্রোফিজিক্যাল ইনস্টিট্যুটে সংরক্ষিত হয়। বার্লিনের পৌরপ্রধান এই মূর্তিটি সেদিন—সেই স্মরণীয় ১৪ই মার্চ—উন্মোচন করেছিলেন। এই ইনস্টিট্যুটের নাম এখন প্রথম আইনস্টাইন টাওয়ার। এই উপলক্ষ্যে বার্লিনের নাগরিকরা একটি নতুন বাসভবন তৈরি করিয়ে বিজ্ঞানীকে উপহার স্বরূপ প্রদান করেন।

১৯৩১। গ্রীষ্মকাল। জার্মানীতে হিটলারের অভ্যুদয় সমগ্র য়ুরোপে এক বিভীষিকাময় যুগের ইঙ্গিত বহন করে নিয়ে এসেছে। ওদিকে ইতালিতে ঘটেছে মুসোলিনীর আবির্ভাব। পৃথিবীতে যে একটা দুর্দিন আসন্ন সেটা তাঁর দূরদৃষ্টি বলে আইনস্টাইনের

বুঝতে কিছুমাত্র বিলম্ব হয়নি। তারপর যেদিন জার্মান রাষ্ট্রের চ্যান্সেলার পদে অধিষ্ঠিত হয়ে, নাৎসী-নায়ক এ্যাডলফ হিটলার শুরু করলেন ইহুদী নির্যাতন সেইদিন এই সত্যটা বিজ্ঞানীর কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে, এই দেশে থাকা আর নিরাপদ নয়—তাঁকে সপারবারে এই দেশ ত্যাগ করে চলে যেতে হবে—কিন্তু তিনি যাবেন কোথায় ? ইহুদীজাতির উপর হিটলারের ঘৃণা যতই প্রবল হয়ে উঠতে থাকে, আইনস্টাইন ততই বিচলিত হয়ে পড়েন। তারপর যেদিন তিনি একটি বিশ্বস্তসূত্রে জানতে পারলেন যে, হিটলারের নাৎসীদলের পক্ষ থেকে তাঁর মাথার মূল্য ধার্য করা হয়েছে বিশ হাজার মার্ক, তখন ঈষৎ হেসে এলসাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—'এটার দাম কি এতো ?'—এই বলে ডান হাত দিয়ে পত্নীকে তাঁর মাথাটি দেখিয়েছিলেন।

—তা এতো দাম হবেই তো।

—কেন ?

—এই মাথাটার মধ্যেই সৃষ্টি হয়েছে সৃষ্টি ধ্বংস করার অস্ত্র !

—তার অর্থ ?

—সেই তোমার $E=mc^2$ সূত্রটি ; ওটাই তো পরমাণু বোমার জনক।

—কিন্তু সেটা তো এখনো প্রমাণিত হয়নি। পরমাণু বিভাজন হোক আগে।

১৯৩২। জার্মানীতে নির্বাচনে নাৎসীদলের জয়লাভের সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পদধ্বনি ক্রমেই সরব হয়ে উঠছে। একটি বিশ্বযুদ্ধ তিনি দেখেছেন। আবার যুদ্ধ আসবে—একথা-চিন্তা করতেই তিনি যেন চঞ্চল হয়ে ওঠেন। হয়ে ওঠেন আতঙ্কিত। শুধু নিজের কথা ভেবে নয়, পৃথিবীশুদ্ধ মানুষের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে। সামরিক অভ্যুত্থানের সম্ভাবনা দেখে তখন থেকেই গঠিত হয়েছে একটি আন্তর্জাতিক যুদ্ধ প্রতিরোধী সংঘ (War Registars International) ; প্রত্যেক

জাতির মনে শুভবুদ্ধি জাগিয়ে তোলাই এই সংঘের উদ্দেশ্য। সংঘের প্রত্যেকটি সভ্য এই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে কাজ করতেন। শান্তিবাদী আইনস্টাইন এই সংঘের সহিত সংযুক্ত হয়ে একে নানাভাবে সহায়তা করেন। অস্ত্রশস্ত্রের পরিবর্তে শুভ ইচ্ছা—সংঘের এই ছিল লক্ষ্য। এই সময়ে জার্মানির একাধিক বিজ্ঞানীকে তিনি যে পত্রখানি লিখেছিলেন শান্তি আন্দোলনের ইতিহাসে তা উদ্ধৃত হলো ঃ 'Let us mobilize good will rather than arms. Let science be an example of peaceful occupation. Why not refuse to lend your talents to invention of deadly weapons or chemicals.' কিন্তু তাঁর এই প্রচেষ্টায় তেমন সাড়া মেলে নি। মুষ্টিমেয় যে কয়জন বিজ্ঞানী এতে সাড়া দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে মনোবিজ্ঞানের প্রবক্তা সিগমুণ্ড ফ্রয়েডের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিল।

১৯৩৩। হিটলার তখন জার্মানির সর্বময় কর্তা। চ্যান্সেলর। ইহুদী নির্যাতন তীব্র হয়ে উঠেছে। বার্লিনে অবস্থান ইহুদীদের পক্ষে এক রকম অসম্ভব হয়ে ওঠে। আইনস্টাইন এই সময় সপরিবারে দেশের বাইরে ছিলেন। সেখানে যখন সংবাদ পৌছল যে, তাঁদের বার্লিনের বাসস্থানে হিটলারের ঝটিকা বাহিনী হানা দিয়েছে, তখন বার্লিনে প্রত্যাবর্তন করা নিরাপদ হবে না মনে করে তিনি বেলজিয়ামে চলে এলেন। শুরু হয় নির্বাসিতের জীবন। বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয় ও এখানকার অ্যাকাডেমি অব সায়ান্স—এই দুটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর ছিল ত্রিশ বছরের সম্পর্ক। বেলজিয়াম থেকে তিনি তাঁর পদত্যাগ পত্র পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এই সম্পর্ক ছিন্ন করতে তাঁর মনে বড় কম বেদনা জাগেনি সেদিন। এ আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি। প্ল্যাঙ্ক প্রমুখ তাঁর সতীর্থগণ পত্রযোগে কত অনুরোধ জানালেন তাঁকে বার্লিনে ফিরে আসার জন্য। কিন্তু হিটলারের জার্মানিতে তিনি আর ফিরে আসেন নি। এই বছরেই

তিনি ফ্রয়েডের সহযোগিতায় 'Why War ?' নামক একটি পুস্তক লিখেছিলেন। য়ুরোপের শান্তিকামীদের কাছে এটি খুব প্রশংসা লাভ করেছিল।

এরপর বিজ্ঞানীর জীবনে শুরু হয় এক নতুন অধ্যায়। য়ুরোপ নয়, আমেরিকার নিউ জার্সি হয়ে উঠেছিল তাঁর বাসস্থান। জীবনের পরবর্তী তের বছর তিনি এইখানেই অতিবাহিত করেছিলেন আমেরিকান নাগরিক হিসাবে। এখানে আসার বছর সাত পরে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন। নিউ জার্সির প্রিন্সটনে অবস্থিত ইনস্টিট্যুট ফর অ্যাডভ্যান্স স্টাডি আইন-স্টাইনকে অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত করেছিলেন। এই নিয়োগের নেপথ্য কাহিনীটা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। বেলজিয়ামে থাকতেই যখন তাঁর কাছে ইনস্টিট্যুটের পক্ষ থেকে আমন্ত্রণ আসে তখন তাঁকে একটি পত্রে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, কি পরিমাণ বেতন তিনি প্রত্যাশা করেন ? ইনস্টিট্যুটের কর্তৃপক্ষ জানতেন এ রকম একজন বিশ্ব-বিশ্রুত বিজ্ঞানীকে পাওয়া সৌভাগ্যের বিষয়।

তখন তিনি এলসার সঙ্গে এই বিষয়ে পরামর্শ করেন। আলোচনা করেন। ডলারের দেশ আমেরিকা ; ওখানকার জীবনধারার সঙ্গে আইনস্টাইন তেমন পরিচিত ছিলেন না। নিয়োগপত্রে বেতনের স্থানটি ফাঁক ছিল ; সেই স্থানটি তাঁর পূরণ করে দেবার কথা। এলসা যখন তাঁর স্বামীকে জিজ্ঞাসা করলেন 'কতো চাইবে ? মাসে দু-তিন হাজার ডলার ?'—তখন উত্তরে তিনি বলেছিলেন 'অত চাইব ?' শেষ পর্যন্ত স্ত্রীর কথা অনুযায়ী তিনি তিন হাজার ডলার লিখে দিয়েছিলেন। প্রিন্সটনে ইনস্টিট্যুটে যখন এই চিঠি এলো তখন তাঁরা রীতিমত বিস্মিত হয়েছিলেন। তারা একটি উত্তরে জানালেন, 'প্রিয় অধ্যাপক আইনস্টাইন, আপনি আমাদের অনুরোধ রক্ষা করেছেন জেনে আমরা ধন্য হলাম। আপনার মতো একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ বিজ্ঞানীকে পাওয়া সৌভাগ্যের বিষয়। তবে যে বেতন

আপনি চেয়েছেন সেই বিষয়ে কিছু বক্তব্য আছে। এখানকার জীবনযাত্রার মান সম্পর্কে, মনে হয়, আপনার বিশেষ ধারণা নেই। তিন হাজার ডলার যৎসামান্য, তাতে আপনার ব্যয় সংকুলান হওয়া দুষ্কর। আপনাকে আমরা মাসিক ছয় হাজার ডলার বেতনেই নিযুক্ত করলাম।'

১৯৩০ সালে পাঁচ মিলিয়ন ডলার খরচ করে স্থাপিত হয় এই ইনস্টিট্যুট। এর প্রতিষ্ঠাতা ডঃ এব্রাহম ফ্লেক্সনার। তিনি ছিলেন একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্। উদ্যোক্তারা একটি মেডিক্যাল ইনস্টিট্যুট স্থাপন করতে আগ্রহী ছিলেন। ডঃ ফ্লেক্সনার যখন তাঁদের বোঝালেন যে ঐ জাতীয় প্রতিষ্ঠান এখানে অনেক আছে ; বরং এমন একটি উচ্চমানের অ্যাকাডেমিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হোক যা পৃথিবীর কোথাও নেই—আকর গণিতের (Basic Mathematics) গবেষণার একটি প্রধান কেন্দ্র স্থাপন করলে ভালো হয়। বিশ্বের সেরা তত্ত্বীয় পদার্থবিদ্‌রা এখানে এসে অধ্যাপনা করবেন, আর মৌলিক বিষয়ে গবেষণা করবেন। তাঁর কথায় উদ্যোক্তারা সায় দিয়েছিলেন। স্থাপিত হওয়ার পর ডঃ ফ্লেক্সনার যোগ্য প্রতিভার সন্ধানে য়ুরোপে এলেন এবং প্রথমেই তিনি বেলজিয়ামে গিয়ে আইনস্টাইনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ও তাঁকে এই প্রতিষ্ঠানে যোগদান করতে অনুরোধ করেন। তখন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকেও অনুরূপ একটি অনুরোধ তাঁর কাছে এসেছে। ডঃ ফ্লেক্সনার জানতেন বিশ্ববিশ্রুত এই বিজ্ঞানীকে পেলে পরে শুধু ইনস্টিট্যুটের গৌরব বৃদ্ধি পাবে না, অন্যান্য খ্যাতিমান বিজ্ঞানীরাও এখানে অধ্যাপক হিসাবে আসবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করবেন। তাঁর অনুমানই ঠিক হয়েছিল। আইনস্টাইন প্রিন্সটনের ইনস্টিট্যুট ফর অ্যাডভ্যান্স স্টাডিতে যোগদান করবার পর, এই প্রতিষ্ঠানে অধ্যাপক হিসাবে যোগদান করার জন্য তখনকার নোবেল পুরস্কার বিজ্ঞানীরা যেন সেখানে লাইন দিয়ে দাঁড়ালেন। প্রথিতযশা পদার্থবিদ্ রোলাণ্ড ওপেনহেমার ছিলেন

ইনস্টিট্যুটের প্রথম পরিচালক। আইনস্টাইন যোগদান করার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পৃথিবীর অন্যতম সর্বশ্রেষ্ঠ গণিতবিদ্ ডঃ জন ভন নিউমেন এখানে অধ্যাপক হিসাবে যোগদান করেন ও মৃত্যুকাল পর্যন্ত (১৯৫৭) এখানেই ছিলেন। নানা বিষয়ে তিনি আইনস্টাইনের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন।

প্রিন্সটনের রমণীয় পরিবেশ আইনস্টাইন-দম্পতিকে মুগ্ধ করলো। আগে থেকেই চিঠি লিখে আইনস্টাইন জানিয়েছিলেন তিনি যখন পৌঁছবেন তখন তাঁদের অভ্যর্থনার জন্য যেন কোনো আড়ম্বর না থাকে। ইনস্টিট্যুটের কর্তৃপক্ষ সেইরকম ব্যবস্থাই করেছিলেন। তাঁরা জাহাজঘাটে দু'জন ট্রাস্টিকে পাঠিয়েছিলেন তাঁকে নিয়ে আসার জন্য। সেখান থেকে প্রিন্সটন শহরের দূরত্ব পঞ্চাশ মাইল। এখানে তাঁর আগমনের অনেক আগে থেকেই নিউ জার্সির সংবাদ-পত্রগুলিতে কিন্তু আইনস্টাইনের সচিত্র সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। এটা আইনস্টাইন জানতে পেরেছিলেন যখন বিকেলে একটা দোকানে তিনি একটি পেন্সিল কিনতে বেরিয়েছিলেন। সেই সময়ে দোকানের মধ্যেই একদল ছাত্র তাঁকে ঘিরে দাঁড়াতেই তিনি যারপরনাই বিস্মিত বোধ করেন। সেই ছাত্র-জনতার মধ্য থেকে তাঁকে উদ্ধার করবার জন্য অমনি একদল পুলিশ এগিয়ে আসে। তিনি আরো অবাক হয়ে গেলেন যখন একজন অফিসার তাঁকে বললেন—'ভয় নেই, স্যার। আমরা আপনাকে এই ভীড় থেকে উদ্ধার করে আপনার বাসস্থানে পৌঁছে দেব।'

—এই ছাত্ররা কি আমার পরিচয় জানে? তোমরাও কি জানো আমি কে? বলেন বিমূঢ় বিস্মিত বিজ্ঞানী।

জানি স্যার। আজ কদিন ধরে খবরের কাগজে শুধু আপনার কথাই বেরুচ্ছে।

পরের দিন। ইনস্টিট্যুটের অফিসে এলেন আইনস্টাইন। বিরাট বিস্তৃত ভূখণ্ডের উপর অবস্থিত এই শিক্ষায়তনটির পরিবেশ তাঁর দৃষ্টি

আকর্ষণ করল। চারিদিকে বৃক্ষশোভিত গোথিক স্থাপত্য রীতিতে তৈরি এটি। প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যদিও এর কোন সম্পর্ক ছিল না, কিন্তু এখানকার অধ্যাপকদের আবাসস্থল ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি অংশে—'Fine Hall' তার নাম। ইনস্টিট্যুটের প্রতিষ্ঠাতা ডক্টর ফ্লেক্সনার ছিলেন প্রধান কর্মকর্তাদের মধ্যে একজন। তিনি এসে আইনস্টাইনকে জিজ্ঞাসা করলেন 'আপনার দপ্তরটি কিভাবে সজ্জিত করা হবে?'

—আমার প্রয়োজন কেবলমাত্র একটি টেবিল, একটি চেয়ার এবং একটি ব্ল্যাকবোর্ড। প্রশস্ত ঘরটির চারদিকে তাকিয়ে বললেন অধ্যাপক আইনস্টাইন। কিছুক্ষণ বাদে বললেন—'আর একটা বাজে কাগজপত্র রাখার ঝুড়ি যার মধ্যে আমার গাণিতিক হিসাবের ভুলভ্রান্তিগুলি নিক্ষেপ করতে পারি।

ইনস্টিট্যুটে অধ্যাপকগণ পালা করে লেকচার দিতেন। আইন-স্টাইনের প্রথম বক্তৃতার দিন প্রচুর জনসমাগম হয়েছিল, তাঁদের মধ্যে অধ্যাপক ও ছাত্র ভিন্ন স্থানীয় লোকও ছিল। আর উপস্থিত ছিল খবরের কাগজের রিপোর্টার ও ফটোগ্রাফার। এর পর থেকে সংবাদপত্রে তাঁর বক্তৃতা দেবার দিনের উল্লেখ থাকত না। কেবল মাত্র বুলেটিন-বোর্ড মারফৎ ইনস্টিট্যুটের সদস্যরা জানতে পারতেন, ১১৩ নম্বর ঘরটিতে কোন্‌দিন গাণিতিক সেমিনার বসবে। এইটিই ছিল আইনস্টাইনের অফিস। এখানে আসার অল্পদিনের মধ্যেই তিনি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। সতীর্থগণের সহৃদয়তা, আন্তরিকতা ও প্রীতিপূর্ণ ব্যবহারে তিনি যেমন মুগ্ধ হয়েছিলেন, তেমনি স্থানীয় অধিবাসীদের সৌজন্য তাঁর কাছে কম প্রীতিপ্রদ ছিল না।

একবার বড়দিনের সন্ধ্যায় তাঁর আবাসস্থলের সবুজ ঘাসে আবৃত লনটিতে এসে উপস্থিত হয়েছে একদল ছেলেমেয়ে। ফুটফুটে চেহারা তাদের। সেই লনে এসে তারা বড়দিনের গান (Carole) গাইতে থাকে। এমন সময় তাঁর ঘর থেকে বাইরে

বেরিয়ে এলেন বিজ্ঞানী। হাসিমুখে তাদের স্বাগত জানিয়ে বললেন— 'আমার বেহালাটি নিয়ে আমি যদি তোমাদের সঙ্গে অন্যান্য অধ্যাপকদের আবাসে যাই, তা হলে কেমন হয় ?'

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। খুব ভালো হয়। একসঙ্গে বলে ওঠে ছেলেমেয়ের দল। তাদের সঙ্গে বেহালা বাজাতে বাজাতে সেদিনের সন্ধ্যায় আইনস্টাইনকে ঘুরতে দেখে সকলেই বিস্মিত হয়েছিলেন। একজন বিজ্ঞানী যে এমন সরল হতে পারেন এটা যেন তাঁদের ধারণার বাইরে ছিল। এই সারল্যই ছিল মহামতি আইনস্টাইনের চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

১৯৩৪। আমেরিকার বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান 'দি আমেরিকান এসোসিয়েশন ফর দি অ্যাডভ্যান্সমেণ্ট অব সায়েন্স' আইনস্টাইনকে নিমন্ত্রণ করলেন একটি বক্তৃতা দেবার জন্য। বক্তৃতার স্থান ছিল পিটসবার্গে কার্নোজি ইনস্টিট্যুট অব টেকনলজি। য়ুরোপ ও আমেরিকার একাধিক বিদ্বৎ প্রতিষ্ঠানের সামনে তিনি বক্তৃতা করেছেন। সুন্দর সুমিষ্ট বাচনভঙ্গিতে প্রদত্ত তাঁর বক্তৃতা শুনবার মত ছিল। কিন্তু এবারকার বক্তৃতা একটু স্বতন্ত্র রকমের ছিল। বাছাইকরা সাড়ে চারশো শ্রোতা টিকিট কিনে এই বক্তৃতা শুনতে এসেছিলেন। টিকিটের হার ছিল একশো ডলার। বক্তৃতার দিন দেখা গেল লেকচার হলের মধ্যে প্রবেশ লাভের জন্য তিন হাজার দর্শকের সমাবেশ হয়েছে ইনস্টিট্যুটের বাইরে। যে কোনো দামের টিকিট কিনে তারা এই বক্তৃতা শুনতে প্রস্তুত ছিল। কিন্তু তাদের নিরাশ হতে হয়েছিল।

তুমুল হর্ষধ্বনি উঠেছিল যখন তিনি বক্তৃতা মঞ্চের ওপর এসে দাঁড়ালেন। এখন তিনি এসব ব্যাপারে অভ্যস্ত হয়েছেন, কিন্তু তথাপি বুঝে উঠতে পারলেন না কিসের জন্য এই হর্ষধ্বনি। জড়পিণ্ড ও শক্তির (mass and energy) পারস্পরিক সম্পর্ক

নতুন পদ্ধতিতে নির্ধারণ করা যায় না—এটাই তিনি বক্তৃতায় বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করলেন। শ্রোতারা সকলেই কৃতবিদ্য এবং বিজ্ঞানে পারঙ্গম। এখানে উল্লেখ্য যে, আইনস্টাইনের বক্তৃতার ফাঁকে ফাঁকে থাকত কৌতুকের বিদ্যুৎ চমক্। লেকচার হলের এক পাশে সংবাদ-পত্রের কয়েকজন রিপোর্টার উপবিষ্ট ছিলেন তাঁদের নির্দিষ্ট আসনে। তাঁদের মধ্যে একজন প্রশ্ন করলেন—'আপনি কি বিশ্বাস করেন যে, কেবলমাত্র বিজ্ঞানীদের মধ্যে বিজ্ঞান সীমাবদ্ধ থাকবে?'

—একটা প্রচলিত ধারণা আছে বটে যে, বিজ্ঞান শুধু বিজ্ঞানীদের জন্য, কিন্তু এটা যদি অংশত সত্য হয়—এবং সেটাই প্রকৃত কথা—বিজ্ঞান অবশ্য প্রত্যেকের জন্য।

—ইউনিফায়েড ফিল্ড থিওরিতে আপনি কতদূর অগ্রসর হলেন?—জিজ্ঞাসা করেন আর একজন রিপোর্টার।

—আমার অবশ্যই আশা আছে—তবে সে শুধুই আশা—সুনিশ্চিত কিছু নয়। কেউ যদি একটি গভীর বৈজ্ঞানিক সমস্যা সমাধান করবার চেষ্টা করে, তাকে আগে থেকেই বুঝে নিতে হবে যে, সমাধান পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। তবে সব সময়েই ধৈর্যের সঙ্গে কাজ করে যেতে হবে, কখনো নিরাশ হলে চলবে না।

বিজ্ঞানীর এই সরল উত্তর সকলকে খুশি করলো।

একদিন সকাল বেলায় এলসা একটি চিঠি এনে স্বামীর হাতে দিয়ে বলেন, 'সরকারী চিঠি ভিসা অফিস থেকে এসেছে।' শুনে তিনি একটু বিস্মিত হলেন। কী ব্যাপার, এলসা? ব্যাপারটা হলো তাঁদের ভিসার মেয়াদ শীঘ্রই উত্তীর্ণ হবে। হয় তাঁদের বেলজিয়ামে ফিরে যেতে হবে নতুবা এখানকার নাগরিকত্ব গ্রহণ করতে হবে। ইনস্টিট্যুটের কাজে সতীর্থদের প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার সবই তাঁর ভালো লেগেছে। অনেক চিন্তার পর তিনি গণতন্ত্রের পীঠস্থান আমেরিকার নাগরিকত্ব গ্রহণ করবেন ঠিক করলেন।

তরুণ বয়সে তিনি সুইস নাগরিকত্ব গ্রহণ করেছিলেন, আজ পরিণত বয়সে তিনি গ্রহণ করবেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব। অতঃপর একদিন নিউ জার্সির ট্রেনটনে ভিসা অফিসে গিয়ে তিনি নাগরিকত্ব সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সই করে এলেন। ১৯৪০ সাল থেকে আইনস্টাইন আমেরিকার নাগরিক হন। একটা নিশ্চিন্ত ভ্রাম্যমাণ ইহুদী জীবনে এখন এলো স্থিতাবস্থা। তখন কিন্তু এলসা বেঁচে ছিলেন না। ১৯৩৬ সালের ডিসেম্বর মাসে তাঁর মৃত্যু বিজ্ঞানীর জীবনে এনে দিয়েছিল এক অপরিসীম শূন্যতা। সেবা স্নেহ আর মমতা দিয়ে তিনিই তো তাঁর স্বামীর জীবন সুখময় করে তুলেছিলেন।

॥ সাত ॥

১৯৩৯ সালের শরৎকালে য়ুরোপে শুরু হলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। নিউ জার্সিতে তাঁর প্রিন্সটনের আবাসস্থলে বসে বেতারে এই সংবাদ যেদিন শুনলেন আইনস্টাইন, সেদিন তাঁর মন বিষাদে ভারাক্রান্ত হয়ে গিয়েছিল। তাঁর তখনকার মানসিক অবস্থার পরিচয় আছে এই সময়ে প্রকাশিত তাঁর দুটি বইতে—'The World As I see It, এবং Out of My Latter Years'. স্বৈরতন্ত্রী অধিনায়কদের কঠিন সমালোচনাপূর্ণ এই বইটি খুলে পড়লে পরে আমরা জানতে পারি চিরশান্তিবাদী এই বিজ্ঞানী কেমন করে মানবজাতিকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য সেদিন এক আত্মনিবেদিত যোদ্ধার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

এই বছরটি বিজ্ঞানের ইতিহাসেও স্মরণীয় হয়ে আছে। প্রখ্যাত বিজ্ঞানী অটোহান পরমাণুর বিভাজনে সফল হয়েছিলেন। এই বছরেই দুইজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী এনরিকো ফের্মি ও শিলার্ড প্রিন্সটনে আইনস্টাইনকে এক চিঠিতে জানালেন অসীম শক্তিধর পরমাণু বোমার কথা। য়ুরোপে হিটলার-দানবের আবির্ভাবে ধ্বংস ও হিংসার ভয়াবহ লীলার পরিণতি কল্পনা করে তিনি তখন যারপরনাই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলেন। আশংকা করলেন জার্মানরা যদি পরমাণু বোমা তৈরি করে ফেলে এবং নির্বিচারে তা ব্যবহার করতে থাকে, তাহলে তো মানব সভ্যতা ধ্বংস হয়ে যাবে। ফের্মি ও শিলার্ডের চিঠির মধ্যে যে সংবাদটুকু ছিল তা তাঁকে বিচলিত

করে তুলেছিল। ডেনমার্কের প্রখ্যাত পরমাণু বিজ্ঞানী নীলস্ বোর (Niels Bohr) তখন প্রিন্সটনে অবস্থান করছিলেন। ইনি আইনস্টাইনের চেয়ে বয়সে ছ'বছরের ছোট ছিলেন। ১৯১৩ সালেই তিনি পরমাণুর গঠন (structure of atom) সম্পর্কে তাঁর মৌলিক তত্ত্ব প্রকাশ করে বিজ্ঞানী সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। তাঁরই আবিষ্কার পরমাণু-শক্তির বিকাশের পথ প্রশস্ত করে দিয়েছিল। ইনিই সেদিন ঘোষণা করেছিলেন আইনস্টাইনের $E=mc^2$ সূত্রটি যে সত্য তা পরমাণু বিজ্ঞানে প্রমাণিত হল।

ফের্মি ও শিলার্ডের চিঠিখানা ইনস্টিট্যুটের সতীর্থদের দেখালেন আইনস্টাইন। 'এখন আমাদের কি কর্তব্য?' তাঁর এই প্রশ্নের উত্তরে তাঁরা সকলে তাঁকে বললেন, 'আর কিছুমাত্র বিলম্ব না করে এ্যাটম বোমা তৈরি করার কথা চিন্তা করতে হবে। প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট যাতে এই বিষয়ে তৎপর হন সেজন্য আমরা তাঁকে অনুরোধ করে একটি চিঠি লিখব। আর সেই চিঠিতে স্বাক্ষর থাকবে মাত্র একজনের।

—কার? জিজ্ঞাসা করেন আইনস্টাইন।

—আপনার।

পরবর্তী ইতিহাস সুপরিচিত। এই বইয়ের শুরুতেই সেই রোমাঞ্চকর ঘটনাটি উল্লিখিত হয়েছে। ১৯৪৫ সালে হিরোসিমা ও নাগাসাকিতে পরমাণু বোমার বিস্ফোরণের পরিণতি দেখে শান্তিকামী বিজ্ঞানী সেদিন ভেঙে পড়েছিলেন মনুষ্যত্বের এই অবমাননায়। এই সময়ে এক বন্ধুকে একটি চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন—'আমার আশংকা হয়, এই পৃথিবীতে যতদিন মানুষ থাকবে, ততদিনই চলতে থাকবে হিংসার বীভৎস কাণ্ড।'

এলসা মারা যাওয়ার পর থেকে আইনস্টাইন এক রকম নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করতে থাকেন। সংসারে তিনি চিরকালই নিঃসঙ্গ পথিক ছিলেন। কিন্তু এবারকার নিঃসঙ্গতা ছিল অসহনীয়। জীবনের

সবচেয়ে বড় বন্ধনটি ছিন্ন হয়ে গেছে। 'He is all my life.'—এই কথা এলসা একবার বলেছিলেন একজন সাংবাদিককে আইনস্টাইন সম্পর্কে। এলসা তাঁর দোভাষী ছিলেন, অন্যের সঙ্গে যোগসূত্রের কাজ করতেন, তিনি তাঁর স্বামীর যথার্থ জীবনসঙ্গিনী ছিলেন, এক নিবিড় স্নেহ দিয়ে তাঁকে তিনি সর্বদা ঘিরে রাখতেন। যেদিন পীড়িতা স্ত্রীকে হাসপাতালে পাঠিয়েছিলেন, সেদিন বিজ্ঞানীর মনে খুবই আশা ছিল যে, আরোগ্যলাভের পর এলসা আবার বাড়িতে ফিরে আসবেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুতে যখন সে আশা ছিন্ন হয়ে যায় তখন কিছুকাল তাঁকে উদ্‌ভ্রান্তের মতো দিন কাটাতে দেখা গিয়েছিল। অনেকদিন পর্যন্ত তাঁর হাতে বেহালা ওঠেনি। কিন্তু এলসার প্রথম পক্ষের কন্যা দুটি—মার্গট ও হেলেন—যখন থেকে আইনস্টাইনের সেবা ও পরিচর্যায় নিজেদের সঁপে দিয়েছিল তখন থেকে শোকের তীব্রতা কমে এসেছিল। হেলেন তো আগে থেকেই বিজ্ঞানীর সচিবের কাজকর্ম করতো, মায়ের মৃত্যুর পর সে মায়ের অন্যান্য কর্তব্যগুলিও সম্পন্ন করতে থাকে। সংসারের হিসাবপত্র যেমন রাখতো তেমনি বিজ্ঞানীকে দর্শনপ্রার্থীদের উৎপাত থেকেও রক্ষা করতো। একদিন হয়েছে কি প্রাতঃভ্রমণ শেষ করে আইনস্টাইন যখন গৃহে ফিরলেন তখন তিনি দেখতে পেলেন বাইরের বারান্দায় একজন রিপোর্টার অপেক্ষা করছিল।

—আপনার সেক্রেটারি আমার মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। কিন্তু আমি যদি আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎকারের একটা বিবরণ না নিয়ে যেতে পারি তাহলে যে চাকরিটা চেষ্টা করছি সেটা পাওয়া আমার পক্ষে কঠিন হবে—হয়ত পাবই না।

অপেক্ষমাণ রিপোর্টারের মুখে এই কথা শুনে সহানুভূতিতে ভরে যায় বিজ্ঞানীর মন। শীতে ছেলেটি কাঁপছিল। আইনস্টাইন তাকে বললেন—'তুমি ভেতরে চলো ; আমি তোমার মনস্কামনা

পূর্ণ করব—ইণ্টারভিউ দেব।’ ‘তবে হেলেন দেখে ফেলার আগে সেটা শেষ করতে হবে।’

রিপোর্টারটি চলে গেলে পরে এতখানি সময়ের অপব্যবহারের দরুন হেলেনের কাছে মৃদু ভর্ৎসনা শুনতে হয়েছিল আইনস্টাইনকে। ‘কিন্তু ছেলেটি আমার দেশের লোক—উলমেই ওর জন্ম।’ মেয়েকে বলেন তিনি মৃদুভাবে।

—দেশের লোক হলেই বা, তোমার তো অনেকখানি সময় নষ্ট হলো।

—কিন্তু ছেলেটির তো উপকার হলো, হেলেন।

এমনি মহাপ্রাণ মানুষ ছিলেন আইনস্টাইন। প্রিন্সটনে তাঁর দিনগুলি আগের মতোই অতিবাহিত হয়। কখনো তিনি ইনস্টিট্যুটের ফিজিক্স ল্যাবোরেটরিতে গিয়ে ছাত্রদের কাজকর্ম দেখতেন ; যন্ত্রপাতি অথবা গবেষণার পদ্ধতি উন্নত করার জন্য তাদেরকে মাঝে মাঝে প্রস্তাব দিতেন। তরুণ বিজ্ঞানীদের একটি উপদেশ তিনি সব সময় দিতেন—‘Research is largly a matter of character and devotion to the question at hand···’ গবেষণার মধ্যে মনপ্রাণ ঢেলে দেওয়াটাই গবেষকের প্রথম কাজ—আইনস্টাইনের এই উপদেশটি সর্বকালের জন্য সত্য।

১৯৩৭। তাঁর বড় ছেলে হ্যানস এ্যালবার্ট ১৯৩৭ সালে আমেরিকায় এসে প্রথমেই বাবার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। কৃষ্ণচক্ষু, প্রতিভাদীপ্ত মুখশ্রী ও তারুণ্যমণ্ডিত পুত্রকে দেখে পিতা খুশি হলেন। হ্যানস তাঁর প্রথম সন্তান। তাকে স্বাগত জানিয়ে সহাস্য মুখে আইনস্টাইন জিজ্ঞাসা করেন, ‘তোমার বৌ-ছেলেমেয়ে সব কোথায়? কেমন আছে তারা?’

—ভালো। তবে আমার এখানে একটা কাজ না হওয়া পর্যন্ত তাদের আনব না।

চাকরির ব্যাপারে ছেলেকে সাহায্য করতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন,

কিন্তু হ্যানস নিজে থেকেই বলেছিলেন বাবাকে—'আমি নিজের পায়েই দাঁড়াতে চাই। আপনাকে এজন্য বিব্রত হতে হবে না—ধরাধরি বা সুপারিশ-পত্রের প্রয়োজন হবে না।' তারপর আইনস্টাইন যেদিন খবর পেলেন যে, হ্যানস মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারের কৃষিবিভাগে ইঞ্জিনীয়ারের চাকরি পেয়েছে সেদিন তাঁর হৃদয় আনন্দে ভরে গিয়েছিল। ছেলে যে জীবনে কৃতকার্য হবে এ বিষয়ে তিনি সুনিশ্চিত হলেন।

১৯৩৮। আইনস্টাইনের একটি নতুন বই প্রকাশিত হল—'Evolution of Physics.' পদার্থবিজ্ঞানের ক্রমবিকাশ সম্পর্কে একটি সহজ ও সরল বই। তরুণ পদার্থবিদ বার্লিন থেকে বিতাড়িত উদ্বাস্তু লিওপোল্ড ইনফেল্ডের সহযোগিতায় লেখা এই বইটিতে আইনস্টাইনের আইডিয়াগুলি খুব সহজ ভাবেই বিবৃত হয়েছে প্রশ্নোত্তরের ভঙ্গিতে। প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বইটি 'Best seller'-এর গৌরব লাভ করেছিল। সারা পৃথিবী থেকেই প্রকাশকের কাছে অর্ডার আসত। এই বইটির প্রত্যেকটি কপিতে আইনস্টাইনের স্বাক্ষর থাকত। সহযোগী গ্রন্থকার ইনফেল্ড প্রিন্সটনে আইনস্টাইনের অন্যতম সহকারী ছিলেন। বইটির পরিকল্পনা তাঁরই ছিল। পরে ইনি কানাডাতে টোরোনটো বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি নিয়ে চলে যান।

১৯৩৯। ১৪ই মার্চ।

আইনস্টাইন ষাট বছর বয়সে পদার্পণ করলেন।

য়ুরোপের ওপর আসন্ন বিশ্বযুদ্ধের কালো ছায়া আতঙ্কের সৃষ্টি করেছে। পরমাণুর গবেষণা পৃথিবীকে কোন পথে নিয়ে যাবে—এই চিন্তাই তাঁর জন্মদিনের আনন্দকে ম্লান করে দিয়েছিল। পৃথিবীর সর্বদেশ থেকেই আসতে থাকে উপহার, কার্ড, চিঠি ও টেলিগ্রাম। বেতারে ডঃ রবার্ট ওপেনহেমার শ্রদ্ধাঞ্জলি জানিয়ে বললেন—

'জীবিত বিজ্ঞানীদের মধ্যে আজ সবচেয়ে পরিচিত ব্যক্তি হলেন একজন তিনি আলবার্ট আইনস্টাইন। তাঁর জীবন ও চিন্তায় বিজ্ঞান আজ নতুন ব্যঞ্জনা লাভ করেছে।' কিন্তু পৃথিবীর ভবিষ্যৎ, মানব সভ্যতার ভবিষ্যৎ চিন্তা করে এই মানুষটির মনে সেদিন—তাঁর সেই জন্মদিনে—অশান্তির যেন সীমা-পরিসীমা ছিল না।

১৯৪০। অক্টোবর। আইনস্টাইনের জীবনে একটি স্মরণীয় বৎসর। মার্গট ও হেলেনকে নিয়ে তিনি আমেরিকার নাগরিকত্বের শপথ গ্রহণ করলেন। ঘটনাটি সংবাদপত্রে ফলাও করে প্রচারিত হলো। 'ক্রিশ্চান সেঞ্চুরি পত্রিকায়' লেখা হলো—'অধ্যাপক আইনস্টাইন আর নির্বাসিত বা উদ্বাস্তু নন। তিনি এখন আমেরিকার অধিবাসী—an American in America—এখানকারই নাগরিক।' মার্কিন নাগরিকত্ব লাভ করে তিনি নিজেকে গর্বিত বোধ করলেও, তিনি কখনো বিস্মৃত হননি যে, তিনি একজন বিশ্বনায়ক। যুদ্ধের জন্য ইংলণ্ড থেকে আগত উদ্বাস্তু ছেলেমেয়েদের সাহায্যার্থে তখন এই দেশে আমেরিকান ফ্রেণ্ডস সার্ভিস কমিটি নামে একটি সমিতি গঠিত হয়েছিল। নাগরিকত্ব লাভ করার পর, এই কমিটির জন্য অনুষ্ঠিত একটি 'বেনিফিট কনসার্ট' যখন হয়, আইনস্টাইনকে অনুরোধ করা মাত্র তিনি সেই অনুষ্ঠানে বেহালা বাজিয়েছিলেন। তাঁর বেহালা বাজানর জন্য প্রচুর টিকিট বিক্রী হয়েছিল।

১৯৪১। ডিসেম্বর ৭।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এখন সমগ্র পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত হয়েছে।

একদিকে রোম-বার্লিন-টোকিও অক্ষশক্তি, অন্যদিকে মিত্রশক্তি; এই শিবিরে ছিল ইংলণ্ড, ফরাসী, রাশিয়া। আমেরিকা তখনো পর্যন্ত যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেনি। কিন্তু উনিশশো একচল্লিশ সালের সাতই ডিসেম্বর জাপানী বিমানবহর যখন অতর্কিতে আমেরিকার

বিখ্যাত পার্ল হার্বার বন্দরটি আক্রমণ করল তখন আমেরিকার পক্ষে যুদ্ধে মিত্রশক্তির শরিক হয়ে যোগদান করা ভিন্ন আর কোনো উপায় ছিল না। যুদ্ধ ঘোরালো হয়ে উঠলো। এই ঘটনার পর য়ুরোপ থেকে আমেরিকায় সমাগত উদ্বাস্তুদের সাহায্যের জন্য আইনস্টাইন তাঁর প্রয়াস জোরদার করতে থাকেন। মার্কিন সরকার ওয়ার বণ্ড বিক্রী শুরু করবেন ঠিক করলেন। এজন্য চলচ্চিত্র মারফৎ প্রচারের যে ব্যবস্থা হয় তাতে অংশ গ্রহণ করলেন বিজ্ঞানী। তাঁকে নিউজ রীল মারফৎ রূপোলী পর্দায় দেখা গেল। সেই সময় মার্কিন সরকার পরমাণু বোমা তৈরি করার কথা চিন্তা করলেন। এরই ফলশ্রুতি ছিল 'ম্যানহাট্টান প্রজেক্ট'। এই প্রকল্পটির সঙ্গে যে সমস্ত বিজ্ঞানী সংযুক্ত ছিলেন আইনস্টাইন নানাভাবে তাঁদের পরামর্শ দিতেন। সে সব পরামর্শ খুবই মূল্যবান ছিল। এখানে উল্লেখ্য যে অটো হ্যান, নীলস্ বোর প্রমুখ য়ুরোপের সেরা পরমাণু বিজ্ঞানীরা তখন আমেরিকায় এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন এবং তাঁদেরই সহায়তায় মার্কিন সরকার এই মারাত্মক প্রকল্পটি গঠন করেছিলেন। অক্ষশক্তি বা হিটলারের কাছে এই সংবাদ ঘূণাক্ষরেও পৌঁছতে পারে নি। বিজ্ঞানীদের দিয়ে এই জাতীয় মারণাস্ত্র তৈরি করিয়ে নিতে পারবেন, এই ছিল যুদ্ধবাজ হিটলারের মতলব। তাঁর এই দুরাশা শেষ পর্যন্ত চরিতার্থ হতে পারেনি।

দেখতে দেখতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পাঁচ বছরে পড়লো। জলে, স্থলে এবং অন্তরীক্ষে চলছিল তুমুল ধ্বংসলীলা। বিরতির লক্ষণ ছিল না। সেই সময়ে—১৯৪৫ সালের গ্রীষ্ম ঋতুর শেষভাগে আইনস্টাইন মারানাক হ্রদে অবকাশ যাপন করতে গিয়েছিলেন। ৬ অগস্ট যখন নৌকাযোগে ফিরছিলেন তখন নিউইয়র্ক টাইমস পত্রিকার একজন রিপোর্টার এসে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। আগন্তুক গম্ভীর বদনে বললো—'একটি পরমাণু বোমা আজ হিরোসিমা শহরের ওপর ফেলা হয়েছে প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের নির্দেশক্রমে।

আমার সম্পাদক এই সংবাদটা আপনাকে জানাতে বলেছেন।' একটু থেমে রিপোর্টারটি বলতে থাকে—'ষাট হাজারেব বেশি লোক মারা গিয়েছে সেখানে, বিকিকরণ-জনিত অসুখের (radiation sickness) দরুন আরো অনেকে মারা যাবে।

ধ্বংসের ভয়াবহতায় বিজ্ঞানী যেন স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন সেদিন। তিনি অসুস্থ বোধ করলেন। তাঁর এক জীবনীকার লিখেছেন, 'এইভাবে পরমাণু বোমা ব্যবহার করা হবে এটা যদি জানতাম তা হলে আমি কখনই পরমাণু গবেষণার ব্যাপারে অগ্রসর হওয়ার জন্য মার্কিন সরকারকে চিঠি লিখে পীড়াপীড়ি করতাম না। তখন আমাদের সামনে ছিল বেপরোয়া হিটলারী আক্রমণের বিভীষিকা'—এই উক্তি তিনি অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে, বেদনার সঙ্গে করেছিলেন। অনুশোচনায় তাঁর মন ভরে গিয়েছিল। আটলান্টিক মন্থলি পত্রিকার ১৫ নভেম্বর সংখ্যায় আইনস্টাইনের বিখ্যাত বক্তব্য প্রকাশিত হলো—

'I do not consider myself the father of the release of atomic energy. My part in it was quite indirect. I did not, in fact, foresee that it would be released in my time. I believed only that it was theoretically correct,'

অর্থাৎ, 'পরমাণু শক্তির প্রয়োগের ব্যাপারে আমি নিজেকে এর জনক বলে বিবেচনা করি না। এই ব্যাপারে আমার যেটুকু ভূমিকা ছিল তা পরোক্ষ। আমার জীবিতকালেই এই বিস্ফোরণ ঘটবে এটা আমার কল্পনার বাইরে ছিল। তাত্ত্বিকভাবে এটা সম্ভব আমি শুধু এইটুকু বিশ্বাস করেছিলাম।'

এই ঘটনার পর থেকেই আইনস্টাইন একেবারে বদলে গেলেন। যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবার পর একদিন খবরের কাগজে একজন রাজনৈতিক নেতার একটি উক্তি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনি লিখেছেন—

'যুদ্ধে মিত্রশক্তির জয়লাভ হয়েছে সত্য, কিন্তু পৃথিবীতে শান্তি আসেনি।' তখন তিনি মনে করলেন, এই তো একটা কাজের মতো কাজ যা আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রহণ করা যেতে পারে। পৃথিবীতে যাতে স্থায়ী শান্তি স্থাপিত হতে পারে—সেই মহৎ কাজেই অতঃপর তিনি আত্মনিয়োগ করবেন ঠিক করলেন। বিজ্ঞানীর খোলস থেকে বেরিয়ে এলেন শান্তিবাদী আইনস্টাইন। জীবনের পরবর্তী দশ বৎসর কাল তিনি শান্তির পতাকা কাঁধে নিয়ে বেড়িয়েছেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিণতি বিজ্ঞানীর চিন্তার মধ্যে এনে দিয়েছিল একটা দারুণ পরিবর্তন। পরমাণু বোমা যাতে নিষিদ্ধ হয় এবং পরমাণু শক্তি যাতে শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হয়, সেজন্য বিশ্বের বিজ্ঞানীদের অবহিত হতে হবে—এই কথা তিনি তাঁর সতীর্থদের বলতেন। 'মানবজাতি আজ যেখানে এসে দাঁড়িয়েছে সেখানে তার ধ্বংস অনিবার্য।' এই সময়ে একদিন একজন রিপোর্টার তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিল—'তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে কি রকম অস্ত্র ব্যবহার করা হবে?'—তখন তার উপরে আইনস্টাইন বলেছিলেন আমি জানি না। তবে আমি তোমাকে বলতে পারি চতুর্থ যুদ্ধে ওরা কি ব্যবহার করবে। ওরা রকেট ব্যবহার করবে।'

হিরোসিমা ও নাগাসাকির ঘটনার পর অর্থাৎ পরমাণু বোমা যখন সত্যসত্যই ফাটলো তখন থেকেই এই বিজ্ঞানীকে নানা সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। বিজ্ঞানীকেই দায়ী করা হলো বার বার মানুষের অমঙ্গল ডেকে আনার জন্য। এই সময়ে তিনি এই মূল্যবান উক্তিটি করেছিলেন—'যদি কাউকে এজন্য দায়ী করতে হয় তা বিজ্ঞান নয়, রাজনীতি। বিজ্ঞানীরা রাজনীতি বোঝেন না, কারণ এটা প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞান থেকে অনেক বেশি জটিল। জটিল এবং দুর্বোধ্য। ইতিহাস এই সাক্ষ্যই দেয় যে, যুগে যুগে

পৃথিবীতে যত অকল্যাণ, যত অমঙ্গল দেখা দিয়েছে তার প্রত্যেকটির জন্য দায়ী রাজনীতিবিদরাই।

যুদ্ধের পর ইহুদীদের জন্য প্রতিষ্ঠিত হলো একটি স্বাধীন রাষ্ট্র—ইসরাইল। মানব-সভ্যতার ইতিহাসে ইহুদীদের মতো অভিশপ্ত জাতি আর দুটি ছিল না—চিরকালই এরা ভ্রাম্যমাণ। 'Wandering Jew'—এদের ললাটে লেখা থাকত এই পরিচয়। না আছে নিজেদের রাষ্ট্র, না আছে নিজস্ব স্বতন্ত্র একটি বাসভূমি। দীর্ঘকাল সংগ্রামের পর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষে প্যালেস্টাইনে যখন ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয় তখন আইনস্টাইন শুভেচ্ছা সফরে গেলেন সেখানে। নব প্রতিষ্ঠিত ইসরাইল রাষ্ট্রের প্রথম নির্বাচিত সভাপতি ছিলেন আইনস্টাইনের বন্ধু ডঃ চেইম ওয়াইজম্যান। ১৯৫২ সালে তাঁর মৃত্যুর অল্পকাল পরে তাঁর কাছে আমন্ত্রণ ও অনুরোধ এলো সভাপতির পদ গ্রহণের জন্য। এই পদ গ্রহণে তাঁর অক্ষমতা জানিয়ে সেদিন আইনস্টাইন বলেছিলেন—'কোথায় ওয়াইজম্যান আর কোথায় আমি। আমার কোনো রাজনৈতিক যোগ্যতা নেই এই পদের জন্য।'

আইনস্টাইনের জীবনের শেষ তেরটি বছর কেটেছে নিরলস ও নিবিড়তর বিজ্ঞান সাধনায়। এই মহাবিশ্বে প্রাণ-অপ্রাণ সকলের নিয়ন্ত্রণে একই নীতি নানাভাবে স্বপ্রকাশ এমনই একটি সুস্পষ্ট ধারণা তার সমস্ত সত্তাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। বিজ্ঞানী হয়ে উঠেছিলেন দর্শনিক। দার্শনিক আইনস্টাইনের পরিচয় আছে তাঁর এই সময়কার লেখা 'The World As I See It' বইটির প্রতিটি পৃষ্ঠায়। এই বইটির এক স্থলে তিনি লিখেছেন—'My passionate interest in social justice and social responsibility has always stood in curious contrast to a marked lack of desire for direct association with men and women···I have never belonged to one country

or state, to my circle of friends, or even to my own family. I belong to the whole world—to the humanity at large.'

অর্থাৎ, 'আমি চিরকালই সব রকম সামাজিক ন্যায়বিচার ও সামাজিক দায়িত্ব সম্পর্কে গভীর আগ্রহ প্রকাশ করে এসেছি। প্রত্যক্ষভাবে আমি কিন্তু পৃথিবীর নরনারীর সান্নিধ্যে আসার জন্য বিশেষ আগ্রহ বোধ করিনি।···আমি কোনো একটি দেশের বা রাষ্ট্রের নই, নই আমি আমার বন্ধুবর্গ বা পরিবারবর্গের অন্তর্ভুক্ত। আমি সমগ্র পৃথিবীর, সমস্ত মানব-সমাজের।'

আবার এই মানুষকেই আমরা বলতে শুনি—'প্রকৃতির জটিলতম রহস্য আমার কাছে অনেক সহজে ধরা দিয়েছে—কিন্তু মানব-মনের বিচিত্র জটিলতা আমার কাছে চিরকাল রহস্যাবৃত।' বলেছি, হিরোসিমা ও নাগাসাকিতে প্রলয়ঙ্কর ঘটনা ঘটে যাওয়ার জন্য কয়েক বছর আইনস্টাইন আত্মধিক্কার ও মনোবেদনায় অভিভূত হয়েছিলেন। তাঁর মুখের হাসি মিলিয়ে গিয়েছিল। তারপর ধীরে ধীরে আশাবাদী আইনস্টাইন মন থেকে বিষণ্ণতা দূর করেছিলেন। সেই থেকে তাঁর এক জীবনীকার লিখেছেন, তিনি বক্তৃতা করে, প্রবন্ধ লিখে মানুষকে বোঝাতে থাকেন যে, পরমাণু শক্তি শুধু ধ্বংসই করে না, মানুষের কল্যাণও করে। 'পরমাণু শক্তি মানবকল্যাণে প্রয়োগ করা হবে—এই আমার আশা।' সব সময় তাঁর মুখে এই কথাটি শোনা যেত।

ইনস্টিস্টুট্যটের কাজ থেকে তিনি অবসর নিলেন। কর্তৃপক্ষ কিন্তু আইনস্টাইনকে 'এমিরিটাস অধ্যাপক পদে নিযুক্ত করলেন। তখনো তিনি প্রত্যহ তাঁর অফিসে গিয়ে বসতেন; জিজ্ঞাসু ছাত্রদের সঙ্গে তত্ত্বীয় বিজ্ঞানের নানাবিধ বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেন। ১৯৪৯ সালে তিনি গুরুতরভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। চিকিৎসকগণ তাঁর প্রাণের আশা ত্যাগ করেছিলেন। যাই হোক এলসার

মেয়েদের ঐকান্তিক সেবা, পরিচর্যা ও যত্নের ফলে তিনি সুস্থ হয়ে উঠেছিলেন। আবার তিনি স্বাভাবিক কাযকর্মের জগতে ফিরে এলেন। আবার তিনি পিয়ানোটির কাছে এসে বসলেন; আবার তিনি হাতে তুলে নিলেন তাঁর চিরজীবনের সঙ্গী বেহালা।

১৯৫৫। মে মাস।

আপেক্ষিক তত্ত্বের পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হলো।

এই উপলক্ষে সুইজারল্যাণ্ডের বার্ন শহরে এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনের প্রস্তুতি চলছিল বছরের শুরু থেকেই। জুলাই মাসে এই অনুষ্ঠান হবার কথা। উদ্যোক্তাদের আশা ছিল এই বিস্ময়কর তত্ত্বের উদ্ভাবক যিনি সেই মহাবিজ্ঞানী আইনস্টাইন সশরীরে এই স্মরণীয় অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন। সেই মর্মে তাঁর কাছে আমন্ত্রণও প্রেরিত হয়েছিল। ১৪ মার্চ, ১৯৫৫। বিজ্ঞানীর জীবনে পঁচাত্তর বছর পূর্ণ হলো। জন্মদিনের কেকটি কাটতে কাটতে ওপেনহেমার বলেছিলেন—'আপনার আপেক্ষিক তত্ত্বের জন্মদিন—পঞ্চাশ বছর পূর্তি উৎসব—এগিয়ে আসছে।' তারপর যখন তাঁকে পরিকল্পিত অনুষ্ঠানের কথা জ্ঞাপন করা হয়, তখন বিজ্ঞানী বলেছিলেন—'এই বয়সে অতদূর যাওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। তবে আমার তত্ত্বটির ওপর ভিত্তি করে যে সব সভা হবে, তার কার্যসূচী আমি তৈরি করে দেব।'

এই সময়ে একদিন সংবাদপত্রের এক রিপোর্টার তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসে জিজ্ঞাসা করে—'নতুন কিছুর ওপর কাজ করছেন?' সহাস্যবদনে বিজ্ঞানী উত্তর দিলেন; 'আমি সব সময়ে নতুন কিছুর ওপর কাজ করি; অন্ততঃ নতুন কিছু নিয়ে চিন্তা করি।'

১৯৫৫। এপ্রিল মাস।

আইনস্টাইন আবার অসুস্থ হলেন। খবর পেয়ে তাঁদের

পারিবারিক চিকিৎসক এলেন। তিনি আবার বিশেষজ্ঞদের আহ্বান করলেন। তাঁরা রোগীকে পরীক্ষা করে বলেন, অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হবে। আইনস্টাইন বাধা দিলেন। তখন পর্যবেক্ষণের জন্য তাঁকে প্রিন্সটন হাসপাতালে নিয়ে আসা হলো। পিতার অসুস্থতার সংবাদ পেয়ে পুত্র হ্যানস ক্যালিফোর্নিয়া থেকে চলে এসেছেন। ছেলেকে দেখে বলেন—'এখন অনেকটা সুস্থ আছি।'

১৬ই এপ্রিল ১৯৫৫ সাল। দার্শনিক রাসেল পারমাণবিক যুদ্ধ বিরোধী এক ইস্তাহার স্বাক্ষর করার জন্য আইনস্টাইনের কাছে পাঠালেন। অসুস্থ শরীরে আইনস্টাইন স্বাক্ষর দিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর ইস্তাহারটি প্রকাশিত হয়েছিল। এই ইস্তাহারটি আজ রাসেল-আইনস্টাইন ইস্তাহার নামে পরিচিত। পরবর্তী সময়ে এই ইস্তাহারকে পথ-প্রদর্শক হিসেবে ধরে নিয়ে বিজ্ঞানীরা শান্তির জন্য পাগ্‌ওয়াল সম্মেলন আরম্ভ করেন।

কিন্তু এর দু'দিন পরেই, ১৮ এপ্রিল, ১৯৫৫, হাসপাতালে বিজ্ঞানীর জীবনদীপ চিরকালের মতো নির্বাপিত হয়ে যায়। বিংশ শতকের এক অতুলনীয় মানুষ, আপেক্ষিক তত্ত্বের প্রবক্তা, পরমাণু যুগের স্রষ্টা তাঁর জীবনের কর্তব্য শেষ করে এই পৃথিবী থেকে চিরবদায় গ্রহণ করলেন—যে পৃথিবীর রহস্য উদঘাটনে তিনি আত্মনিয়োগ করেছিলেন ষোল বছর বয়স থেকেই। তাঁর মৃত্যুতে পৃথিবীতে বিজ্ঞান জগতে নেমে এসেছিল এক বিরাট শূন্যতা। সেই শূন্যস্থান আজো পূর্ণ হয়নি।

॥ আট ॥

লোকান্তরিত হলেন বিশ্ববরেণ্য বিজ্ঞানী। পিছনে রেখে গেলেন তিনি তাঁর যুগান্ত-সৃষ্টিকারী নানা আবিষ্কার। তাঁর মৃত্যুতে সমগ্র পৃথিবীতে সেদিন যেরকম সর্বজনীন শোকের তরঙ্গ উঠেছিল তা ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে। চারটি মহাদেশের প্রত্যেকটি বিশ্ববিদ্যালয়, প্রত্যেকটি বিজ্ঞান-পর্ষদ থেকে প্রিন্সটনে যেসব শোক-বার্তা প্রেরিত হয়েছিল তার সংখ্যা ছিল কয়েক সহস্র। এর থেকেই আমরা আইনস্টাইনের বিপুল জনপ্রিয়তা, তাঁর সর্বজনীনতার যে পরিচয় পাই তা ছিল এক কথায় তুলনারহিত। বিজ্ঞানীর স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করে সেদিন তাঁরই সতীর্থ নীলস বোর বলেছিলেন—'The memories he has left behind will remain ever-living source of fortitude and encouragement.'—অর্থাৎ তিনি পিছনে যে সব স্মৃতি রেখে গেছেন তা সর্বকালের জন্য ধৈর্য ও উৎসাহের জীবন্ত উৎস হয়ে থাকবে।

বিজ্ঞানীর জীবন পরিক্রমা শেষ হলো।

এবার মানুষ আইনস্টাইনের কথা। সারা জীবন ধরে যাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল সুদূর নক্ষত্রলোকের প্রতি, তিনি যে সহৃদয়তার সঙ্গে তাঁর আশপাশের মানুষকে দেখতে চেষ্টা করেছেন, এটাই তো তাঁর চরিত্রের মহত্ত্ব, জীবনের পরম গৌরব। তাঁর এই চারিত্রিক মহত্ত্বের উজ্জ্বল আলো শুধু যে এই শতাব্দীকেই উদ্ভাসিত করে

দিয়েছে তা নয় ; পরবর্তী শতাব্দীগুলিও তিনি আলোকিত করে গিয়েছেন। বহুবিধ গুণের আধার ছিলেন এই বিজ্ঞানী। তাঁর ধৈর্য ও সহনশীলতা দেখে তাঁর সতীর্থরাও বিস্মিত হতেন। আর কি নম্র, শান্ত, মধুর প্রকৃতির মানুষ ছিলেন তিনি। তাঁর জীবনেতিহাসে আমরা দেখতে পাই যে, এই বিশ্ববরেণ্য বিজ্ঞানীকেও বিভিন্ন সময়ে বহু বিরুদ্ধ সমালোচনা ও বিদ্রূপের সম্মুখীন হতে হয়েছে। অনেক সময় সভা-সমিতিতে প্রকাশ্য ভাবে তাঁকে গালিগালাজ করা হতো। আইনস্টাইন স্বয়ং উপস্থিত থাকলেও তার প্রতিবাদ করতেন না, বা জবাব দিতেন না। একটি মহৎ মনের অধিকারী ছিলেন তিনি যা সচরাচর বিজ্ঞানীদের মধ্যে দুর্লভ—এই কথা একবাক্যে স্বীকার করেছেন তাঁর সতীর্থগণের প্রায় সকলেই।

আমাদের দেশের অধ্যাপক সত্যেন বোস তাঁর অধ্যাপনা জীবনের এক সময় কিভাবে আইনস্টাইনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে এসেছিলেন, সে সব কথা আগেই উল্লিখিত হয়েছে। তাঁর প্রিয় আচার্যের প্রতি অধ্যাপক বোস কী গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করতেন তা সুবিদিত। এই মহাবিজ্ঞানীর লোকান্তর গমনের পর তিনি লিখেছিলেন—'মানুষ হিসাবে তাঁর ব্যক্তিত্ব ছিল তুলনারহিত। শক্তি বা যুক্তি-হীনতার কাছে তিনি কোনো দিন তাঁর মাথা নত করেননি। মানুষের প্রতি তাঁর বিশ্বাস ছিল অপরিসীম। জীবনে তাঁকে বহু দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে হয়েছে। সম্ভবতঃ সেই কারণে বিজ্ঞানের তরুণ পূজারীদের সম্পর্কে তিনি সবিশেষ কোমলতা ও সহৃদয়তা পোষণ করতেন। হিটলার ও মুসোলিনীর দম্ভের কাছে তিনি নতি স্বীকার করেন নি। তাঁর জীবনের শেষ পর্বে যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাঁরই সূত্র এবং গবেষণাকে আশ্রয় করে পারমাণবিক শক্তির সন্ধান পেলো এবং তা লক্ষ লক্ষ মানুষের ধ্বংসে প্রয়োগ করলো তখন এই নির্মম ও নৃশংস ব্যবহারের প্রতিবাদে আইনস্টাইনের কণ্ঠ সোচ্চার হয়ে উঠেছিল।'

মানবপ্রীতি ও বিশ্বমানবিকতার একটি ভাস্বর দৃষ্টান্ত আইনস্টাইন। তিনি যখন বার্নের পেটেণ্ট অফিসের একজন অখ্যাত পেটেণ্ট পরীক্ষক, আমরা দেখলাম, তখনই তিনি উদ্ভাবন করেছেন আপেক্ষিক তত্ত্ব। বলা বাহুল্য পেটেণ্ট অফিসের কর্তাদের অজ্ঞাতসারে সেই তরুণ বিজ্ঞান চর্চা করে, শতশত বৎসরের প্রচলিত সুদৃঢ় ভিত্তিতে নানা ত্রুটি বের করেছিলেন। লোকে তখন তাঁকে উন্মাদ বলতে দ্বিধা করেনি। কিন্তু তরুণটি যে একজন প্রতিভাবান এই ধারণাটা সেদিন কয়জন করতে পেরেছিল? কিন্তু তাঁর জীবনের পরবর্তীকালের ইতিহাস প্রমাণ করে দিয়েছিল যে পেটেণ্ট পরীক্ষক উন্মাদ নন—তিনি দস্তুর মতো প্রতিভাবান। রূপকথার মতোই তাঁর প্রতিভার স্তরে স্তরে উদ্ভাসনের ইতিহাস। তাঁর বিশেষ অপেক্ষবাদ, সাধারণ অপেক্ষবাদ, আলোক-তড়িৎ ক্রিয়ার ব্যাখ্যা, জড় ও শক্তির মধ্যে সম্পর্ক, স্থান-কালের যথার্থ স্বরূপের ব্যাখ্যা, উত্তেজিত বিকিরণ ইত্যাদি আবিষ্কার এবং এ সম্পর্কীয় নানা বিশ্লেষণ, আমরা দেখলাম, নিউটনীয় জগতের বিজ্ঞানের ধ্যান-ধারণাকে বদলে দিয়ে অধিকতর সুন্দর ও সুদৃঢ় বিজ্ঞান-সৌধকে নির্মাণ করেছে।

যিনি প্রচলিত চিন্তাধারার শুধুমাত্র বিরোধিতা করেন তিনি শক্তিশালী হতে পারেন, প্রতিভাবান তাঁকে কেউ বলবে না। এজন্য প্রয়োজন অসামান্য অবদান। এই পরিপ্রেক্ষিতে আইনস্টাইন হলেন যথার্থ প্রতিভাবান। তাঁর সময়ে তিনি ছিলেন বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী—নব পদার্থবিজ্ঞানের অন্যতম প্রবর্তক বা জনক। শুধুমাত্র বিজ্ঞানী হিসাবেই তিনি বিশ্বজোড়া খ্যাতি লাভ করেননি, তাঁর মহৎ গুণ তাঁকে বিজ্ঞানীর চেয়ে কোন অংশে কম সম্মান এনে দেয়নি। এ হলো তাঁর মানবপ্রীতি ও বিশ্ব মানবিকতা যা একটু আগেই বলেছি। এই দুটি গুণই তো তাঁকে বিশ্ববাসীর কাছে তাদের একজন হিসাবে প্রতিভাত করেছে।

অপেক্ষবাদের স্রষ্টার দিকে আমরা যখন তাকাই, তখন সেই

মহামনীষীর সামগ্রিক মহিমা আমাদের মনের পর্দায় একসঙ্গে ফুটে ওঠে না। ওঠা সম্ভবও নয়। কারণ বিষয়টির তুলনায় পর্দা বড় ছোট। বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের কথা ছেড়ে দিলেও সাধারণ মানুষের মধ্যে যে আইনস্টাইনকে আমরা দেখি তাঁর ব্যাপ্তিও কি কম?

পৃথিবীতে মাঝে মাঝেই এমন মানুষ আসেন যাঁরা পাণ্ডিত্যের গজদন্ত মিনার ছেড়ে নেমে আসেন একেবারে ধূলোমাটির সংসারে। তাঁরা সাধারণ মানুষের সুখতুঃখের সঙ্গী হন, হন সংগ্রামের সাথী। আইনস্টাইন এমনই একজন মহামানব। তিনি একদিকে বিজ্ঞান সাধক, অন্যদিকে মানব-ধর্মের একনিষ্ঠ ধারক, বিশ্বানুভূতির বিশ্বস্ত বাহক।

মানবতাবাদী এই বিজ্ঞানীশ্রেষ্ঠের পরিচয় দিতে গিয়ে তাঁর জীবন-গ্রন্থের পাতা থেকে অজস্র নজির তুলে আনা যায়। ফ্যাসি-বাদের বিরুদ্ধে তাঁর তীব্র ধিক্কার, হিটলারের ইহুদী নিধনের সোচ্চার প্রতিবাদ, হিরোসিমা-নাগাসাকির ধ্বংস যজ্ঞে বেদনারক্তিম আর্তি, যুদ্ধমুক্ত এক শান্ত মানবসমাজের সুন্দর স্বপ্ন ইত্যাদি। কিন্তু আমরা যখন আইনস্টাইনের মানবতাবাদের উৎস সন্ধানে প্রবৃত্ত হই তখন কী দেখতে পাই? দেখতে পাই তাঁর সংগীতপ্রীতি ও তাঁর বৈজ্ঞানিক প্রতীতি। জীবন সত্যের তুই বিপরীত মেরুতে এই তুয়ের অবস্থান। তবু তিনি এই তুই বিপ্রতীপ উপাদানকে প্রতিভার জারক রসে জারিত করে মিলিয়ে নিতে পেরেছিলেন এবং এই উপাদানের যোগফলে কেমন করে গড়ে উঠেছিল আইনস্টাইনের মানবতাবাদ সেই রহস্যের অনুসন্ধান সত্যিই কৌতূহল জাগায়।

সুরলোক তাঁকে নতুন সৃষ্টির অনুপ্রেরণা দিত, খুলে দিত মনের নিভৃতে দ্বারগুলি। মোজার্টের সোনেটা যখন ধ্যানগম্ভীর চৈতন্যের উপত্যকা বেয়ে নেমে আসত তখন সেই সুরের আলোয় বিজ্ঞান সাধক দেখতেন মানুষের মুখ। তুঃখী মানুষেরা ভিড় করে আসত

তাঁর অস্তিত্বকে ঘিরে। সুরলোকই তাঁকে হাত ধরে নিয়ে গিয়েছিল দুর্লভ মানবলোকে। 'গানের ভিতর দিয়ে যখন দেখি ভুবনখানি/ তখন তারে চিনি, আমি তখন তারে জানি।'—রবীন্দ্রনাথের এই উপলব্ধি আইনস্টাইনের ক্ষেত্রেও সত্যি। সুরকে ভালবাসা জীবনকে ভালবাসার নামান্তর। এর প্রমাণ রবীন্দ্রনাথ, এর প্রমাণ আইনস্টাইন।

এরপরেই আসে আইনস্টাইনের বৈজ্ঞানিক দার্শনিক প্রতীতির প্রসঙ্গ। আইনস্টাইন বিশ্বাস করতেন এবং সারা জীবনের বিজ্ঞান সাধনায় সে বিশ্বাসকে তত্ত্বাকারে উপস্থিত করেছেন যে, বস্তুকে পরিণত করা যায় শক্তিতে, শক্তি পরিণত হতে পারে বস্তুতে। বস্তু ও শক্তির পারস্পরিক ঘাত-প্রতিঘাতে পৃথিবী চলেছে আপন ছন্দে। আইনস্টাইন বস্তুর মধ্যে শক্তিকে উপলব্ধি করেছেন। এটাই তাঁর ঐহিকতা। আর ঐহিকতাই যে মানবতার ভিত্তি। তাঁর তত্ত্বকে যদি গাণিতিক সংখ্যায়ন থেকে সরিয়ে নিয়ে বিশুদ্ধ দার্শনিক দৃষ্টি-কোণ থেকে দেখা যায় তাহলে খুঁজে পাওয়া যায় এই মানুষটির মানবতাবাদের সত্যিকারের চাবিকাঠি। তখন আমরা বুঝতে পারি কোন্ অনুপ্রেরণা ঋষিকল্প বিজ্ঞানীকে চিরকাল মানবপ্রেমে আবদ্ধ করে রেখেছিল।

তাঁর শেষ জীবনে বিজ্ঞানী হয়ে উঠেছিলেন একজন দার্শনিক। তখন তাঁর মুখ থেকে উচ্চারিত হয়েছিল এই কথা—'আমি চিরকালই সবরকম ন্যায়বিচার ও সামাজিক দায়িত্ব সম্পর্কে গভীর আগ্রহ প্রকাশ করে এসেছি। আমি কোন একটি দেশের বা রাষ্ট্রের নাগরিক নই। আমি সমগ্র পৃথিবীর, সমস্ত মানব সমাজের অন্তর্ভুক্ত। আমি বিশ্বনাগরিক।'

এই মানুষই উপলব্ধি করেছিলেন যে, জড়ের অতিরিক্ত একটি চৈতন্যশক্তি বিশ্বে সতত ক্রিয়াশীল। তাই তো তিনি রবীন্দ্রনাথের একটি প্রশ্নের উত্তরে নির্দ্বিধায় বলতে পেরেছিলেন 'yes I do

believe there is a Reality outside us.' অর্থাৎ আমি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করি যে আমাদের অস্তিত্বের বাইরে একটি বাস্তব বা দিব্যসত্তা বিদ্যমান।' মানবদরদী তিনি হতে পেরেছিলেন এই জন্যই।

তাঁর পঁচাত্তর বছরের জীবনটা আমরা যদি শ্রদ্ধার সঙ্গে আলোচনা করি তাহলে দেখতে পাব সামাজিক মানবতাবোধই এই বিজ্ঞানীর বিশ্বমানবিকতার মূল উৎস। জীবনের শেষ দুই দশক কাল তাঁকে আমরা দেখতে পাই বিজ্ঞানের তাবৎ নিয়মের ক্ষেত্রে একাগ্রচিত্তে এই মানবতাবোধকেই খুঁজতে। শিক্ষা-দীক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, সমাজ পুনর্গঠন, সরকারী অর্থ ও খাদ্য প্রভৃতির সুষ্ঠু বণ্টনের ক্ষেত্রে তিনি সর্বদাই সন্ধান করেছেন এই সামাজিক সাম্যকে। ব্রুকলিন পলিটেকনিকের এক শ্রমিক সভায় আইনস্টাইন বলেছিলেন—'মানুষের কাছ থেকে খ্যাতির জয়মাল্য লাভ করব, এইজন্যই বিজ্ঞান জানতে হবে বা তা নিয়ে কাজ করতে হবে—এ যেন না হয়। সাধারণ লোকের কথা ভাবো, তাদের ভাগ্য নিয়ে খেলা বন্ধ করো, শ্রমিকদের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করো, জিনিসপত্র সকলের মধ্যে যথাযথ বণ্টনের ব্যবস্থা করো যাতে আমাদের জন্মটা সাধারণের কাছে অভিশাপ না হয়ে আশীর্বাদ স্বরূপ হয়।'

পৃথিবীর আর কোন বিজ্ঞানীর মুখে আমরা এমন দরদভরা কথা কখনো শুনি নি। জাতিতে আইনস্টাইন ছিলেন ইহুদী। বিশ্ববাসীর কাছে তিনি নির্যাতিত ইহুদীদের কথা অত্যন্ত সহৃদয়তার সঙ্গে প্রচার করতেন। ইহুদীদের উপর নাৎসীদলের দমননীতির তিনিই ছিলেন কঠোর সমালোচক। এজন্য তাঁকে জন্মভূমি জার্মানি পরিত্যাগ করে চলে আসতে হয়েছিল। বলতে গেলে এই ইহুদী সমস্যা সমাধানের জন্য তিনি জীবনব্যাপীই আন্দোলন করেছেন এবং চাঁদা তোলার জন্য য়ুরোপ ও আমেরিকার একাধিক কনসার্টে অংশ

গ্রহণ করে বেহালা বাজিয়েছেন। এজন্য তাঁকে জাতীয়তাবাদীর অপবাদ নিতে হয়েছিল।

কিন্তু তাঁর নির্ভীক, উদার ও বলিষ্ঠ চিন্তা সংকীর্ণ জাতীয়তার বহু ঊর্ধ্বে থেকে সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের জন্য সর্বদাই ব্যাকুল থাকতো। এই ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন রবীন্দ্রনাথের সগোত্র। কবির মতো এই বিজ্ঞানীরও আদর্শ ছিল বিশ্বমানবিকতার আদর্শ। ১৯৩১ সালে য়ুরোপ সফরে গিয়ে কবি যখন জার্মানিতে উপনীত হলেন তখন একদিন তিনি বার্লিনে আইনস্টাইনের বাসভবনে গিয়ে তাঁর সঙ্গে আলাপ করে খুবই মুগ্ধ হয়েছিলেন। কবি অনুভব করেছিলেন, এই বিজ্ঞানীর জীবনের বিভিন্ন চিন্তায়, কর্মে বিশ্বমানবতাবোধ কি আশ্চর্যভাবেই না ফুটে উঠেছে। তাঁর মধ্যে এই বোধটাই তীব্র ছিল বলেই না আইনস্টাইন সর্বপ্রকার শোষণের বিরোধিতা করেছেন।

স্বাধীনতার প্রতি ছিল তাঁর গভীর অনুরাগ। একনায়কদের (Dictator) স্বৈরাচারী শাসনকে তিনি কখনোই সহ্য করতেন না —বারবার এদের প্রতি তিনি জানিয়েছেন কঠিন ধিক্কার। একটা দৃষ্টান্তের উল্লেখ করি। ১৯২৭ সালে ইতালির একনায়ক মুসোলিনী বিজ্ঞানী ভোল্টার জন্মশতবার্ষিকীতে সারা বিশ্বের খ্যাতনামা বিজ্ঞানীদের নিয়ে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠান করেন। একমাত্র আইনস্টাইনই এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেননি।

তেমনি স্বৈরাচারী হিটলারের কাছেও তিনি কোনদিন আনুগত্য স্বীকার করেন নি। যুদ্ধোন্মাদ হিটলারের কথায় বিভ্রান্ত হয়ে জার্মানীর সেরা বুদ্ধিজীবীরা জার্মানির সামরিক অভ্যুত্থানকে সমর্থন জানিয়ে একটি চিঠি প্রকাশ করেন। তাতে নিরানব্বই জনের স্বাক্ষর ছিল একমাত্র আইনস্টাইন বাদে। এই ঘৃণ্য কাজের নিন্দা করতে তিনি কোন রকম দ্বিধা বা সংকোচ করেন নি। এজন্য তাঁকে

যথেষ্ট নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছিল। বস্তুত এই মানুষটির চরিত্র আলোচনা করে আমরা দেখতে পাই যে, অত্যাচার, অন্যায় ও অসত্যের সঙ্গে তাঁর কোন আপস ছিল না। কেউ যাতে অবহেলিত না হয় সেদিকে তিনি খুবই সজাগ ছিলেন। বিজ্ঞান কর্মী ও গবেষকদের তিনি কি রকম স্নেহভরে দেখতেন, অকুণ্ঠিত চিত্তে সব রকম সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করে দিতেন, তার সাক্ষ্য দিয়েছেন সত্যেন বোস ও হোমি ভাবা—এই দু'জন ভারতীয় বিজ্ঞানী।

উচ্চপদ, ধনসম্পদ, আর্থিক প্রতিষ্ঠা কিংবা খ্যাতি—কোনটির প্রতি তাঁর আকর্ষণ ছিল না। 'I do not understand why fame continue to be my travelling companion.' এই কথা একবার আইনস্টাইন বলেছেন মার্গটকে। একজন রিপোর্টার বলেছিলেন—'একজন বিজ্ঞানী হিসাবে তাঁর যে শ্রেষ্ঠত্ব তাকে ম্লান করে দিয়েছে সে তাঁর ব্যক্তিত্বের শ্রেষ্ঠত্ব।' মানুষ আইনস্টাইন সম্পর্কে চার্লি চ্যাপলিনের সেই সুন্দর মন্তব্যটি এখানে উল্লেখ্য। তিনি আমেরিকা সফরে এলে পরে বিশ্বের সর্বকালের এই শ্রেষ্ঠ কৌতুক অভিনেতা আইনস্টাইনের সঙ্গে কথা বলে এমন মুগ্ধ হয়েছিলেন যে, তিনি বলেছিলেন—'তাঁকে দেখে এবং তাঁর সঙ্গে কথা বলে আমার মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে যে, আইনস্টাইন যেন শেক্সপীয়ারের সৃষ্ট একটি চরিত্র—তেমনি সম্পূর্ণ মৌলিক, কারো সঙ্গেই তাঁর তুলনা চলে না এবং অবিস্মরণীয় ভাবেই অনন্যসাধারণ।' এই মন্তব্য অক্ষরে অক্ষরে সত্য।

এই মানুষটির জীবনে সবচেয়ে আশ্চর্য বিষয় হলো সংগীতের সঙ্গে বিজ্ঞানের তিনি মেলবন্ধন ঘটিয়েছিলেন। একবার প্যারিসে যখন একজন রিপোর্টার তাঁকে জিজ্ঞাসা করে—কিসে তাঁর বেশি আগ্রহ তখন এর উত্তরে আইনস্টাইন বলেছিলেন—প্রথমে কাজ,

পরে সংগীত। আমি সংগীতের ভেতর দিয়ে চিন্তা-ভাবনা করি। দিনের স্বপ্ন আমি এইভাবেই দেখে থাকি।

অর্থের প্রতি তাঁর বৈরাগ্য সম্পর্কে কত গল্প আছে। বস্তুত এদিক দিয়ে তিনি ছিলেন সাধারণ মানুষ অপেক্ষা ভিন্ন প্রকৃতির। বিত্তবান হবার বহু সুযোগ তাঁর জীবনে এসেছিল, কিন্তু একান্ত অবহেলায় তিনি তা প্রত্যাখ্যান করতেন। রকফেলার ফাউণ্ডেশন থেকে একবার তিনি অনেক টাকার একটি চেক পেয়েছিলেন। দীর্ঘদিন ধরে ঐ চেকটি তাঁর পড়ার বইয়ের পাতায় চিহ্ন হিসাবে (bookmark) ব্যবহৃত হয়। পরে না কি তিনি সেই বইটি হারিয়ে ফেলেন। জার্মানির এক সাময়িক-পত্রের সম্পাদক এক হাজার মার্ক দিয়ে আইনস্টাইনের একটি বক্তৃতা পুনঃপ্রকাশের জন্য আবেদন করেন। আইনস্টাইন একটি চিঠি লিখে ঐ সম্পাদককে জানালেন—'এক হাজার মার্ক এজন্য যথেষ্ট বেশি। আমাকে দুশো মার্ক দিয়ে বক্তৃতাটি প্রকাশ করুন।' এই রকম নির্লোভতার দৃষ্টান্ত এই মানুষটির জীবনে অনেক আছে।

অতি অমায়িক শিশুর মতো সরল প্রকৃতির মানুষ ছিলেন আইনস্টাইন। একসময়ে তাঁকে জার্মানির শ্রেষ্ঠ পট্‌স্‌ড্যাম মান-মন্দিরের অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করবার জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল। কিন্তু তিনি উত্তর দিয়েছিলেন যে তিনি গবেষণার কাজে সময় নষ্ট করতে পারবেন না। অথচ এই পদ পেলে জার্মানীর যে কোনও বিজ্ঞানী নিজেকে কৃতার্থ মনে করতেন সন্দেহ নেই।

মহৎপ্রাণ এই বিজ্ঞানী একজন সংস্কারমুক্ত প্রগতিশীল ছিলেন। একবার জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির কয়েকজন সদস্যের কারামুক্তির জন্য তাঁর সাহায্য ও সহযোগিতা চাওয়া হয়। তাদের মুক্তির জন্য আইনস্টাইন যথাসাধ্য চেষ্টা করেন এবং এই বলে জনমত তৈরি করেন—'রাজনৈতিক মতবাদের দরুন কোন মানুষকে জেলে আটক রাখা হবে কোন মতেই ঠিক নয়। রাজনীতির অর্থ তা

নয়।' তিনি মনে করতেন, সমস্ত মানুষই সমান; মানুষ হিসাবে একজনের সঙ্গে অপরের কোন পার্থক্য থাকা উচিত নয়। জাতিগত বিভেদে আমেরিকাতে একবার আটজন নিগ্রোর ফাঁসির আদেশ হলে আইনস্টাইন তা রদ করবার জন্য একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন। সেই সময় তিনি এই বিখ্যাত উক্তিটি করেছিলেন— 'The colour that flows in my vein is the same as that flow in the vein of the Negros.' (অর্থাৎ আমার শিরায় প্রবাহিত রক্তের যা রঙ, নিগ্রোদের শিরায় প্রবাহিত রক্তেরও ঠিক সেই রঙ।')

১৯১৯। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর, পৃথিবীতে, বিশেষ করে য়ুরোপে, স্থায়ী শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় জেনিভাতে 'লীগ অব নেশনস' বা জাতিসংঘ। এই পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মনীষীদের সম্মিলিত করবার জন্য ১৯২২ সালে 'কমিটি অন্ ইনটেলেকচুয়াল কোঅপারেশন' নামে একটি আন্তর্জাতিক সমিতি গঠিত হয়। এর বিজ্ঞান শাখায় ছিলেন আইনস্টাইন, মাদাম ক্যুরি প্রমুখ শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীগণ। কিছুদিনের মধ্যে শান্তিরক্ষার ভূমিকায় জাতিসংঘের ব্যর্থতার পরিচয় পেয়ে তিনি এই অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন—'শান্তি রক্ষার ব্যাপারে জাতিসংঘ সম্পূর্ণ ব্যর্থ। সমস্ত কাজ আলোচনার মধ্যেই সীমিত থাকে। এমন অবস্থায় একজন শান্তিকামী মানুষ হিসাবে জাতিসংঘের সঙ্গে আমার কোন রকম সম্পর্ক রাখার প্রয়োজন নেই।' তিনি বিশ্বাস করতেন যে, পৃথিবীতে শান্তিরক্ষার জন্য একটি বিশ্ব সরকার (World Government) গঠন করা উচিৎ, যা বিশ্বের সকল দেশ মেনে নেবে।

শুধুমাত্র বিস্ময়কর বৈজ্ঞানিক প্রতিভা নয়, আইনস্টাইনের মানবপ্রীতি ও বিশ্বমানবতা যুগে যুগে উদ্বেলিত করবে জগতের

সমস্ত শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকে। স্থান-কাল-পাত্রের বিবর্তনের বাইরে চেতনাশীল মানুষের মনের আকাশে ধ্রুবতারা হিসাবে চিরভাস্বর হয়ে থাকবে একটি নাম—'আলবার্ট আইনস্টাইন।' বিপুলা এ ধরণী অনন্ত রহস্যের আধার, তার মনটা তো এখনো পর্যন্ত সম্পূর্ণ উদ্‌ঘাটিত হয়নি। আগামী শতাব্দীতে নিউটন, আইনস্টাইন আবার আবির্ভূত হবেন না, এমন কথা কে বলবে !

—শেষ—

পরিশিষ্ট—(ক)

॥ পদার্থবিদ্যার মূলস্তম্ভ ॥

অ্যালবার্ট আইনস্টাইন

[১৯২১ সালে আইনস্টাইন পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। এই পুরস্কার গ্রহণের সময় তিনি যে বক্তৃতা করেছিলেন তারই সংক্ষিপ্ত অনুবাদ এখানে দেওয়া হলো। তাঁর এই বক্তৃতা শুনবার জন্য য়ুরোপের বিশিষ্ট বিজ্ঞানীরা আমন্ত্রিত হয়ে সুইডেনের রাজধানী স্টকহলমে এসেছিলেন। য়ুরোপের একাধিক বৈজ্ঞানিক পত্র-পত্রিকায় আইনস্টাইনের এই বক্তৃতাটি আলোচিত এবং প্রশংসিত হয়েছিল।—লেখক]

আমাদের অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার বিক্ষিপ্ত বৈচিত্র্যকে যুক্তিপূর্ণ চিন্তার মাধ্যমে সুসামঞ্জস্য সূত্রে বা তত্ত্বে গ্রথিত করার প্রচেষ্টাই হলো বিজ্ঞান বা বিশেষ জ্ঞান। অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা হলো বৈষয়িক ঘটনা। কিন্তু তত্ত্ব হলো গভীর চিন্তাপ্রসূত ফল। তত্ত্বের উৎপত্তির মূলে আছে দীর্ঘমেয়াদী অভিযোজন বা প্রতিযোজন এবং এটি কল্পনা-প্রসূত বলে কখনই সম্পূর্ণ বা ধ্রুব নয়। প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞানভিত্তিক চিন্তাধারায় সমস্ত ঘটনা, ধারণা ও অনুবন্ধকে কয়েকটি নিরপেক্ষ মৌল ধারণা ও স্বতঃসিদ্ধে নিবদ্ধ করা হয়।

পদার্থবিদ্যা হলো প্রাকৃতিক বিজ্ঞান যার বিষয়বস্তুর ধারণা পরিমাপের ভিত্তির উপর স্থাপিত এবং ধারণা ও প্রতিজ্ঞাগুলি আবার গাণিতিক সূত্রে আবদ্ধ। বলা যেতে পারে পদার্থবিদ্যা হচ্ছে জ্ঞানের গাণিতিক প্রকাশ। গবেষকের দল পদার্থবিদ্যার বহু শাখার উন্নতি সাধনে ব্যস্ত। তাঁরা পূর্ব অভিজ্ঞতা অনুযায়ী স্ব-স্ব কাজের মধ্য দিয়ে লব্ধ অভিজ্ঞতাগুলির তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা খোঁজেন সূত্রসমূহের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে। ফলে বিংশ শতকে ঘটেছে বহু

যুগান্তকারী আবিষ্কার, মানুষের জীবনে এসেছে বৈপ্লবিক পরিবর্তন। সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে সকল শারীরিক পরিশ্রম লাঘবের।

নানা মনীষীর বহু দিনের নিরলস প্রচেষ্টার ফল হিসাবে এসেছে পদার্থবিজ্ঞানে বহু শাখা-প্রশাখা। প্রতিটি শাখা একাধিক তত্ত্বে ভারাক্রান্ত। তাই প্রয়োজন একীভূত তত্ত্বের। যে তত্ত্বে থাকবে মাত্র কয়েকটি মৌলিক ধারণা ও সূত্র, যাদের উপর ভিত্তি করে যুক্তি পরম্পরায় পাওয়া যাবে সমস্ত ঘটনার ব্যাখ্যা। সমগ্র পদার্থ বিদ্যার ঐ মূল স্তম্ভ বা বুনিয়াদকে খুঁজে বের করতে হবে।

মহামতি নিউটন প্রথম সমগ্র পদার্থবিদ্যাকে একটি স্তম্ভের উপর দাঁড় করাতে চেষ্টা করেন। তাঁর পদ্ধতি বা কাঠামোয় আছে তিনটি মৌলিক ধারণা—(১) ভরবিন্দুতে ভর অপরিবর্তনীয়; (২) দুই ভরবিন্দুর মধ্যে দূর-ক্রিয়া এবং (৩) ভরবিন্দুর গতিসূত্র। নিউটনীয় ধ্যানধারণা উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত বিজ্ঞানী মহলে মূল স্তম্ভ হিসাবে পরিগণিত ছিল। মহাকর্ষ বলের সূত্র সাহায্যে গ্রহ-উপগ্রহের গতিবিধির ব্যাখ্যা, বিচ্ছিন্ন ও অবিচ্ছিন্ন বস্তুর বলবিদ্যা, শক্তির নিত্যতা এবং প্রায় সম্পূর্ণ তাপ-তত্ত্ব নিউটনীয় ধ্যান-ধারণায় গড়ে উঠেছিল। কিন্তু নিউটনীয় তত্ত্ব-প্রভাবিত বিজ্ঞানীরা আলো বিষয়ক বিভিন্ন ঘটনাবলীর ব্যাখ্যায় অসমর্থ হলেন। নিউটনীয় তত্ত্বে তরঙ্গবাদের স্থান নেই। নিউটনের মতে আলো হলো সূক্ষ্ম বস্তুকণিকার সমষ্টি। বস্তু-কণাগুলির শূন্য স্থান দিয়ে আগমন বা এক মাধ্যম থেকে অন্য এক মাধ্যমে আপতনই হলো উৎসের সন্ধান, প্রতিফলন ও প্রতিসরণের কারণ। দ্বন্দ্ব দেখা দিল আলোর গতির ধ্রুবকত্বে, ব্যতিচার, ব্যবর্তন, সমবর্তন প্রভৃতি ব্যাখ্যাতে। হুইগেন্স প্রবর্তিত আলোর তরঙ্গ তত্ত্বে এসব ঘটনার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। ফ্রেনেল ও ইয়ং-এর পরীক্ষা তরঙ্গবাদের সপক্ষে রায় দিলেও নিউটনীয় প্রভাব থেকে বিজ্ঞানীরা মুক্ত হতে পারলেন না।

এরপর এলো ভৌম পদার্থবিজ্ঞান (Field Physics), উন্মুক্ত

হলো নতুন দিগন্ত। নিউটনের বলভিত্তিক বুনিয়াদ কেঁপে উঠল ম্যাক্সওয়েল, হার্টজ ও ফ্যারাডের তরঙ্গ-তত্ত্বে। গাণিতিক সূত্রের সাহায্যে ম্যাক্সওয়েল প্রমাণ করলেন যে, বৈদ্যুতিক আধানের দ্রুত স্পন্দনের ফলে তড়িৎ চুম্বকীয় ক্ষেত্রের সৃষ্টি হয়। তড়িৎ চৌম্বক ক্ষেত্র পরস্পর সমকোণে থাকে এবং বৈদ্যুতিক-চৌম্বক তরঙ্গ ক্ষেত্রদ্বয়ের তলের লম্বাভিমুখে নির্দিষ্ট গতিতে প্রবাহিত হয়। হার্টজ গবেষণাগারে ১৮৮৮ খ্রীস্টাব্দে তড়িৎ-চৌম্বক তরঙ্গ সৃষ্টি করে ম্যাক্সওয়েল তত্ত্বের সত্যতা প্রমাণ করেন। এই নতুন চিন্তাধারার সূত্রপাত করেছিলেন ফ্যারাডে। তাঁর অসামান্য কৃতিত্ব ও প্রতিভা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে হয়। ফ্যারাডে অনুভব করতেন ও বিশ্বাস করতেন যে, প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর কার্যকারণ-সম্পর্ক তড়িৎ-চুম্বকীয় তত্ত্বের উপরই নির্ভরশীল। ১৮৩১ খ্রীস্টাব্দে তিনি তড়িৎ-চুম্বকীয় আবেশ ও ঐ বিষয়ে সূত্রের আবিষ্কার করেন। তাঁরই প্রদর্শিত বিদ্যুৎ প্রবাহে লৌহচূর্ণের সমাবর্তিত অবস্থান বর্তমানের বণ্টনক্ষেত্রের চিন্তাধারাকে প্রভাবিত করেছে।

হুইগেন্স ঈথার মাধ্যমে যে তরঙ্গ প্রবাহের চিন্তা করেছিলেন, ফ্যারাডের উত্তরসূরী ম্যাক্সওয়েল তত্ত্বে তা খণ্ডিত হয়ে প্রমাণিত হলো মাধ্যম ব্যতীত তড়িৎ ক্ষেত্রের অস্তিত্ব। ম্যাক্সওয়েল তত্ত্বেই স্থাপিত হলো আলো ও বিদ্যুতের মধ্যে সেতুবন্ধন। দেখা গেল আলোক তরঙ্গ গতিশীল তড়িৎ-চৌম্বক ক্ষেত্র ছাড়া কিছুই নয়। বিপদ দেখা দিল নিউটনের দূর-ক্রিয়া সূত্রে। স্থিতিয় তড়িৎ আধানে পারস্পরিক বিকর্ষণ বা আকর্ষণ দূর থেকে ক্রিয়ার উদাহরণ নয়। এটি চৌম্বক ক্ষেত্রেরই ফল। মহাকর্ষ ক্ষেত্রেও এটি প্রযোজ্য। নিউটনের বিচ্ছিন্নতাবাদের স্থান পেল অবিচ্ছন্নতাবাদ।

টমসনের পরীক্ষায় যেমন পাওয়া গেল ইলেকট্রনের পরিচয় তেমনি পাওয়া গেল তড়িতাহিত গতিশীল বস্তুর মধ্যে চৌম্বক ক্ষেত্র। এই ক্ষেত্রশক্তি বস্তুর বর্ধিত গতিশক্তির সঙ্গে প্রায় সমান।

বস্তুর পুরাশক্তি, বস্তুর গঠন, জাড্যতা ও মহাকর্ষ ক্ষেত্রের ব্যাখ্যায় নিউটনীয় গতিসূত্র অসম্পূর্ণ। প্রচলিত ক্ষেত্র তত্ত্বেও এদের প্রকৃত ব্যাখ্যা পাওয়া গেল না। প্রকৃত তত্ত্বের সন্ধান পাওয়া গেল বিংশ শতাব্দীতে। একীভূত মূলতত্ত্ব সুদূর পরাহত হলেও নিউটনের প্রকৃতির যান্ত্রিক রূপের ভিত্তি ধসে পড়ল। বর্তমান পদার্থবিদ্যা দুই মতবাদে বিভক্ত। একটি হলো আপেক্ষিক তত্ত্ব আর অপরটি হলো কোয়ান্টাম তত্ত্ব। এই দুই মতবাদ ঘটনাবলীর ব্যাখ্যায় মৌলিকত্বের দাবী রাখলেও একেবারে পরস্পরের বিরোধী নয়।

যুক্তিনির্ভর আপেক্ষিকতাবাদ পদার্থবিদ্যার একটি স্তম্ভ। মাধ্যম ব্যতীত আলোক-তরঙ্গ প্রবাহের ম্যাক্সওয়েলের সমীকরণগুলি লোরেনৎসের রূপান্তরে অপরিবর্তিত থাকে। এই বৈশিষ্ট্য থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, পদার্থবিদ্যার সূত্র বা তত্ত্বগুলি কোন জাড্যগুণসম্পন্ন মাধ্যমে অকাট্য হলে ঐ মাধ্যমের আপেক্ষিক সমবেগে ধাবমান অনুরূপ ঐগুলি অকাট্য থাকবে। বিপরীত ক্রমে বলা যায় যে, স্থানাঙ্ক ও সময় নির্ধারক জাড্যগুণসম্পন্ন মাধ্যমে সমস্ত প্রাকৃতিক নিয়মগুলি লোরেনৎস রূপান্তরে অপরিবর্তনীয়। এটিই বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদের মূল কথা। এর থেকে প্রমাণিত হয় যে দুই স্বতন্ত্র ঘটনার যুগপৎ ঘটা অভিন্ন (invariant) নয়। বস্তুর আয়তন ও ঘড়ির সময় গতিনিরপেক্ষ নয়। আলোর গতির প্রায় সমতুল বেগসম্পন্ন বস্তুর ক্ষেত্রে নিউটনীয় বলবিদ্যা কার্যকরী নয়। একটি বস্তুর স্থিতাবস্থায় ভর (যাকে বলা যেতে পারে জড়ত্বজনিত ভর) m_0 হলে r বেগে ধাবমান অবস্থায় বস্তুটির ভর হবে $m_0 + Ec^2$, এখানে E হলো বেগজনিত বর্ধিত শক্তি এবং c হলো আলোর বেগ। এ থেকে সহজেই বলা যায় যে স্থিতাবস্থায় বস্তুর ভর m_0 গ্রাম হলে তার অন্তর্নিহিত শক্তি m_0c^2 আর্গস। এটিই হচ্ছে ভর ও শক্তির তুল্যতা।

সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের মূলভাবটি নিহিত আছে গালিলিও

ও নিউটননীয় ঘটনার মধ্যেই। কিন্তু ঘটনাটির তত্ত্বীয় ব্যাখ্যাই গুরুত্বপূর্ণ। বাস্তব জাড্য ও ওজন দুইটি পৃথক বিষয় কিন্তু পরিমাপ করা যায় একটি মাত্র ধ্রুবকের মাধ্যমে, যাকে বলা হয় ভর। এ থেকে বলতে হয় যে, কোন স্থানাঙ্ক বা মাধ্যমে কোন নির্ধারকে পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা বলা সম্ভব নয় যে বস্তুটি ত্বরিত বা সরল রেখায় সমবেগে আছে কিংবা লব্ধ ফলসমূহের কারণ মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র। এই ব্যাখ্যায় মহাকর্ষ ক্ষেত্র জাড্যগুণ সম্পন্ন কাঠামো অযৌক্তিক। গ্যালিলিও এবং নিউটনীয় তত্ত্বে একটি অদ্ভুত কাঠামো স্বীকার করা হয়েছে যেখানে জাড্যসূত্র ও গতিসূত্র অকাট্য। এই সমস্যার নিরসনের জন্য প্রাকৃতিক নিয়ম বা সূত্রগুলি এমনভাবে ঠিক করতে হবে যাতে তারা যে কোন চলন্ত কাঠামোয় অপরিবর্তিত থাকে। এটাই হবে সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের অন্তর্নিহিত মূল কাজ। সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ নিউটনীয় ধ্যান-ধারণার পরিবর্তে প্রতিষ্ঠিত হলেও এটি পদার্থবিদ্যার শেষ কথা নয়। সমস্ত ঘটনার মূলে মহাকর্ষক্ষেত্র, না হয় তড়িৎ-চুম্বকীয় ক্ষেত্র।

প্লাঙ্কের শক্তির কণিকারূপে ও আলোর শক্তির কণিকাগুচ্ছ হিসাবে বিশ্লেষণে মুগ্ধ হয়ে নীলস্ বোর পরমাণুর গঠন বিষয়ে এক বিস্ময়কর তত্ত্বের অবতারণা করেন। এই তত্ত্বে প্রকাশিত হলো যে পরমাণু একটি নির্দিষ্ট শক্তির আধার। বাইরের তাপ বা শক্তির প্রভাবে পরমাণু থেকে ফোটন বা শক্তিকণা নির্গত হওয়ার ব্যাখ্যা এতে পাওয়া গেল। যে কোনো পরমাণুর কেন্দ্রীনে একটি প্রোটন (বর্তমানে প্রোটন ও নিউট্রন) আছে এবং ইলেকট্রনগুলি এই কেন্দ্রীনের চারদিকে বিভিন্ন কক্ষপথে ঘুরছে। প্রতি কক্ষপথ একটি নির্দিষ্ট স্তরের। যে কোন স্তরে ইলেকট্রনের শক্তি প্লাঙ্কের ধ্রুবকের উপর নির্ভর করে। সনাতন তত্ত্বে পরমাণুর এরূপ ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। বোরের পরমাণু গঠনতত্ত্ব ম্যাক্সওয়েলের তরঙ্গ-তত্ত্বেও ব্যাখ্যা করা যায় না।

আলোর তরঙ্গধর্ম ও কণাধর্মের মধ্যে সমন্বয় সাধিত হলো হুই' দ্য ব্র্যাগলির বস্তুর তরঙ্গতত্ত্বে। এই তরঙ্গের মূল কথা হলো চলন্ত অবস্থায় যে কোন বস্তু হবে বিভিন্ন বেগের বহু তরঙ্গের সমবায়। এই তত্ত্বকে ভিত্তি করে শ্রোয়েডিঙ্গার তরঙ্গ বলবিদ্যাকে নতুন আঙ্গিকে সাজান। বহু বিতর্কের অবসান এই তরঙ্গ বলবিদ্যায় ঘটলেও ভরবিন্দুর নির্দিষ্ট গতির সঠিক কারণ এতে বোঝা গেল না। দেশ-কালের পরিপ্রেক্ষিতে একটি ঘটনা কিরূপ ঘটে তার গাণিতিক বর্ণনা তরঙ্গ বলবিদ্যায় দেওয়া সম্ভব হলো না। কিন্তু অতি সহজভাবে ম্যাক্সবর্ন এই সমস্যার সমাধান করেন। দ্য ব্র্যাগ্‌লি ও শ্রোয়েডঙ্গারের বস্তু তরঙ্গতত্ত্ব একটি ঘটনার সময় ও স্থানের প্ররিপ্রেক্ষিতে গাণিতিক বর্ণনা। এটি ঘটনা সংক্রান্ত পুরা বিষয়টির সম্বন্ধে লব্ধ জ্ঞানের গাণিতিক বর্ণনা পরি-সংখ্যানের উপর ভিত্তি করে পুরা বিষয়টি থেকে সম্ভাব্য ফলাফলের চিত্র ফুটে উঠে।

একটি উদাহরণেব সাহায্যে কোয়াণ্টাম বলবিদ্যা সম্বন্ধে কিছুটা আলোকপাত করা যেতে পারে। মনে করা যাক, একটি বিশেষ ক্ষেত্র G-তে কোন ভরবিন্দুর উপর কয়েকটি বল ক্রিয়া করছে। সনাতন বলবিদ্যা অনুসারে ভরবিন্দুর গতিশক্তি একটি নির্দিষ্ট মানের কম হলে G ক্ষেত্রের বাইরে কোনো ঘটনা ঘটবে না। কিন্তু কোয়াণ্টাম বলবিদ্যা অনুসারে যে কোনো দিকে (যা আগে থেকে বলা যায় না) G ক্ষেত্রের বাইরে ঘটনা ঘটতে পারে। গ্যামোর প্রকল্পে তেজস্ক্রিয় বিক্রিয়ায় এই ঘটনা ঘটে। এই তত্ত্বে নির্দিষ্ট সময়ে কোনো কাঠামোয় পরিমাপ বিষয়ক সম্ভাব্য ফলাফল নিরূপণ করা হয়। দেশ-কাল সাপেক্ষে ঘটনাটির বর্তমান অবস্থার গাণিতিক প্রকাশ এই তত্ত্বের উদ্দেশ্য নয়। কার্যকারণ সম্বন্ধ পরিষ্কার করে, বাস্তব ঘটনাটি বের না করে এই তত্ত্বে আছে সম্ভাব্যতা, অনিশ্চয়তা ও বিচ্ছিন্নতা।

কোয়াণ্টামবাদকে অস্বীকার করার কোনো হেতু নেই। তবে

আপেক্ষিকতাবাদ ও কণাবাদের উপরেও অধিকতর বোধগম্য ভিত্তিতে বাস্তব ও প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটিত হবে। হাইজেনবার্গের অনিশ্চয় নীতি থেকে বলা যায় যে ভবিষ্যতে কোনো সম্যক জ্ঞান কোন বাস্তব ঘটনার গুণাবলীকে একসঙ্গে সঠিকভাবে পরিমাপ করতে পারবে না। বর্তমানে পদার্থবিদ্যার স্তম্ভ বলে কোনো সাধারণ তত্ত্ব বলা যাচ্ছে না। পরমাণুর ধারণায় বস্তু ও শক্তির কণিকারূপ এবং অতি ক্ষুদ্র প্রাকৃতিক ঘটনায় ক্ষেত্রতত্ত্ব অচল। আবার মহাকাশ, সময়, মহাকর্ষ ও আলোক সীমার বাইরে সত্য সন্ধানে কোয়ান্টামতত্ত্ব অচল। তবে অর্জিত জ্ঞানের থেকে সত্যের সন্ধান অধিকতর মূল্যবান।

পরিশিষ্ট (খ)
প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টকে লেখা আইনস্টাইনের ঐতিহাসিক চিঠি

[এ গ্রন্থের প্রারম্ভিক অধ্যায়ে আইনস্টাইনের যে চিঠিখানি আংশিকভাবে উল্লিখিত হয়েছে তার সম্পূর্ণ বয়ান এখানে দেওয়া হলো। তাঁর লোকান্তর গমনের মাত্র পাঁচ মাস পূর্বে এই বিজ্ঞানী শ্রেষ্ঠ সখেদে বলেছিলেন: 'সারা জীবনে আমি একটিমাত্র ভুল করেছিলাম যখন আমি প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টকে লেখা চিঠিতে আমার স্বাক্ষর প্রদান করেছিলাম। সেই চিঠিতে আমি তাঁকে পরমাণু বোমা (Atom bomb) তৈরি করার জন্য সুপারিশ করেছিলাম।' এই চিঠির তারিখ ২ রা আগস্ট, ১৯৩৯। চিঠির মুসাবিদা ছিল বিশিষ্ট পরমাণু বিজ্ঞানী শিলার্ডের। আইনস্টাইন শুধু নির্দিষ্ট স্থানে স্বাক্ষর প্রদান করেছিলেন। এই চিঠির নেপথ্য প্রেরণাদাতা যিনি ছিলেন তিনি আলেকজান্দার ম্যাক্স; ইনি তৎকালীন আমেরিকার একজন প্রভাবশালী অর্থনীতিবিদ্। এখানে উল্লেখ্য যে চিঠিখানি তখনি হোয়াইট হাউসে প্রেসিডেন্টের কাছে প্রেরিত হয়নি। ছ' মাস নয় দিন বাদে, ১১ অক্টোবর, ১৯৩৯ এটি রুজভেল্টের হাতে পৌঁছেছিল। তখন য়ুরোপে নাৎসীরা পোল্যাণ্ড অধিকার করেছে। প্রেসিডেন্ট কিন্তু তখনি চিঠিখানির তেমন গুরুত্ব দিলেন না। গুরুত্ব দিলেন তখন যখন (১৯৪১, ৭ ডিসেম্বর) জাপানীরা পার্ল হার্বার বন্দরের ওপর অতর্কিতে বোমা নিক্ষেপ করেছিল।]

'প্রিয় মিস্টার প্রেসিডেণ্ট,

সম্প্রতি আমি ইতালির বিখ্যাত পদার্থবিদ্ ফের্মির একটি গবেষণাপত্রের পাণ্ডুলিপি পাঠ করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, অদূর ভবিষ্যতে অথবা নিকট ভবিষ্যতে ইউরেনিয়ামকে (Uranium) শক্তির একটি নতুন উৎস হিসাবে পরিণত করা সম্ভব —সুনিশ্চিতভাবেই সম্ভব। যদি কোনো একটি বন্দরের ওপর এই ধরনের একটিমাত্র বোমার বিস্ফোরণ ঘটে তবে তার ফলে সেই বন্দরটি এবং তার আশপাশ সম্পূর্ণভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। আপনার সরকারের উচিত স্বৈরাচারী একনায়ক হিটলারের বিশ্বগ্রাসী যুদ্ধ অভিযানকে প্রতিহত করার জন্য অবিলম্বে পরমাণু বিজ্ঞানের গবেষণায় মনোযোগী হওয়া। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ পরমাণু বিজ্ঞানী হিসাবে যাঁরা স্বীকৃত তাঁদের অধিকাংশই বর্তমানে আমেরিকায় বাস করছেন। এই বিষয়ে তাঁদের সহায়তা আপনি অনায়াসেই লাভ করতে পারবেন—নতুবা এই যে ভয়াবহ যুদ্ধ চলছে য়ুরোপের অনিবার্য পরিণতি হবে মানবসভ্যতার ধ্বংস।

পরমাণু বোমা তৈরি করার জন্য প্রয়োজন ইউরেনিয়াম—এটাই প্রধান উপকরণ। কিন্তু আপনার রাষ্ট্রে ইউরেনিয়াম অতি সামান্য পরিমাণেই পাওয়া যায়। কিছু ভাল ইউরেনিয়াম খনি আছে কানাডায় আর ভূতপূর্ব চেকোশ্লোভাকিয়াতে। তবে উৎকৃষ্ট ইউরেনিয়ামের প্রধান উৎস হলো বেলজিয়ান কঙ্গো। এই পরি-প্রেক্ষিতে আপনার সরকারের উচিত যে সব পরমাণু বিজ্ঞানী বর্তমানে এই দেশে আধুনিক গবেষণায় নিযুক্ত রয়েছেন তাঁদের সঙ্গে স্থায়ী সংযোগ স্থাপন করা। এই সংযোগ স্থাপনের একটি সম্ভাব্য উপায় হলো, এমন একজনকে দায়িত্ব অর্পণ করা যাঁর ওপর আপনার পরিপূর্ণ আস্থা আছে। তিনি বেসরকারী ভাবে এই দায়িত্ব পরিচালনা করবেন। তাঁর কাজ হবে ঃ

[এক] সরকারী বিভাগগুলির সঙ্গে সংযোগ স্থাপন, পারমাণবিক

গবেষণার ব্যাপারে ঐসব বিভাগীয় প্রধানদের ওয়াকিবহাল রাখা এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্য যথোপযুক্ত ইউরেনিয়াম সরবরাহের পথ সুগম ও সুনিশ্চিত করা।

[দুই] বিশ্ববিদ্যালয়গুলির গবেষণাগারের আয়-ব্যয়ের কাঠামোর মধ্যে পরীক্ষামূলক যে সব কাজ আরম্ভ হয়েছে সেগুলিকে ত্বরান্বিত করা এবং এজন্য প্রয়োজনীয় অর্থ মঞ্জুর করা। একাধিক শিল্প সংস্থার সঙ্গে সংযুক্ত গবেষণাগারগুলির (Industrial laboratories) সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা স্থাপন। তাঁর আর একটি কাজ হবে এই ব্যাপারে আগ্রহী বেসরকারী ব্যক্তিদের সঙ্গেও যোগাযোগ স্থাপন।

'আমি জানতে পেরেছি যে, চেকোশ্লোভাকিয়ার খনিগুলি থেকে জার্মান সরকার এখন ইউরেনিয়াম বিক্রী বন্ধ করে দিয়েছে। এই খনিগুলি বর্তমানে জার্মানির করতলগত। আমি আরো জানতে পেরেছি যে বার্লিনের কাইজার ভিলহেলস্ ইনস্টিট্যুটে ইউরেনিয়াম নিয়ে রীতিমত কাজ শুরু হয়ে গেছে এবং আমি কিছুমাত্র আশ্চর্য হব না যদি দেখি আণবিক বোমা তৈরির ব্যাপারে জার্মানি সকলকে টেক্কা দিয়েছে। তেমন সম্ভাবনা প্রচুর। কারণ ওদেশে বহু কৃতী পরমাণু বিজ্ঞানী রয়েছেন। হিটলারের হাতে যদি এই মারণাস্ত্র এসে যায় তাহলে এই বিশ্বযুদ্ধের যে কী ভয়াবহ পরিণতি হবে সেটা আমাদের গভীর চিন্তার বিষয় নয় কি?

ইতি—ভবদীয়

এ. আইনস্টাইন।'

[এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, হিরোসিমা ও নাগাসাকিতে পরমাণু বোমার বিস্ফোরণের ভয়াবহ পরিণতি দেখে শান্তিকামী আইনস্টাইন সেদিন ভেঙে পড়েছিলেন মনুষ্যত্বের এই অবমাননায়। এই বোমা ফেলার ব্যাপারটা তাঁর অজ্ঞাতসারেই ঘটেছিল। তাঁর তত্ত্বকেই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধবাজরা ধ্বংস যজ্ঞের আয়ুধ হিসাবে কাজে লাগিয়েছে দেখে, এই মানবদরদী বিজ্ঞানতাপস ক্ষুব্ধ ও বিষণ্ণচিত্তে এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছিলেন।]

আইনস্টাইন প্রতিভার মূল্যায়নে একজন ভারতীয় বৈজ্ঞানিক

[১৯২১ সালে আইনস্টাইন নোবেল পুরস্কার পাবার কিছুদিন পরে ১৯২২ সালে বিশিষ্ট ভারতীয় বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহা 'আইনস্টাইন' এই শিরোনামে অধুনালুপ্ত 'নবভারত' পত্রিকায় একটি চমৎকার প্রবন্ধ লিখেছিলেন। এখানে সেই প্রবন্ধটির আইনস্টাইন মূল্যায়ন অংশটি সংক্ষিপ্ত আকারে উৎকলিত করে দেওয়া হলো।—লেখক।]

১৯২১ খ্রীস্টাব্দে পদার্থ বিদ্যায় নোবেল প্রাইজ পাইয়াছেন অ্যালব্রেকট আইনস্টাইন। ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দে জার্মানিতে প্রাকৃতিক দর্শনের মুখপত্র 'Annalen Der Physik' নামক পত্রিকায় A. Einstein-এর স্বাক্ষরযুক্ত একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় ছিল আপেক্ষিকতত্ত্ব। ১৮৯২ খ্রীস্টাব্দে হল্যাণ্ডের বিখ্যাত লিড্রেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এইচ. লোরেনৎস্ এই বিষয়ের আলোচনার সূত্রপাত করেন। উক্ত প্রবন্ধে কতকগুলি অদ্ভুত কথা দৃষ্ট হয়, যথা আলোক ও বিদ্যুৎ তরঙ্গ বহন করার জন্য ইথারের কল্পনা করা আবশ্যক ; কালের ও স্থানের পরিমাণ স্থির নয়, তাহা পরিমাণ কর্তার গতি বা স্থিতির উপর নির্ভর করে।

প্রায় পঞ্চাশ বছর পূর্বে ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল সর্বব্যাপী ইথারের (Ether) কল্পনা করেন এবং আলো ও বিদ্যুৎ উক্ত ইথার সমুদ্রে তরঙ্গ বিশেষ বলিয়া ঘোষণা করেন। দশ বৎসর পরে বার্লিনের হার্টজ সাহেব কতকগুলি সুনিপুণ পরীক্ষা দ্বারা ম্যাক্সওয়েলের মত সত্য বলিয়া প্রমাণ করিলেন। দেখাইলেন যে, ল্যাবোরেটরিতে যন্ত্র সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করাইলে উহা সর্বব্যাপী ইথার সমুদ্রকে তরঙ্গায়িত করে, যেমন জলাশয়ে কোথাও ঢিল ফেলিলে প্রহত বিন্দুর চারিদিকে তরঙ্গ ছড়াইয়া পড়ে। হার্টজ-এর এই পরীক্ষাগুলি হইতে তারহীন টেলিগ্রাফের (Wireless) সূত্রপাত হয়।

আইনস্টাইন বলিলেন, 'ইথারের অস্তিত্ব নাই। ভূখণ্ডে অবস্থান করিয়া যদি একখণ্ড যষ্টিকে একবার পৃথিবীতে রাখিয়া ও একবার কোন তারকায় রাখিয়া তাহার দৈর্ঘ্য নিরূপণ করি তবে এই দুই বারের পরিমিত দৈর্ঘ্য সমান হয় না।' এই ভাবের অনেক কথা লোরেনৎস্‌ও তেরো বৎসর পূর্বে বলিয়াছিলেন, কিন্তু কাল, স্থান, পরিমাণ আপেক্ষিক বলিয়া লোরেনৎস্‌ যে মত প্রচার করেন, তাহা কোন যুক্তিতর্কের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না, কতকগুলি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার মীমাংসার জন্য এই মতের অবতারণা করা হয়।

কিন্তু আইনস্টাইন যুক্তিতর্কের দৃঢ়ভিত্তির উপর আপেক্ষিক-তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করিলেন। এখন 'অ্যানালেন্‌ ডার ফিজিক'-এর অধিকাংশ পাঠকবর্গ অন্ততঃ জুরিচের পদার্থজ্ঞানের অধ্যাপক আচার্য ক্লাইনারের নিকট আইনস্টাইনের মতবাদ অদ্ভুত ঠেকিল। কেহ কেহ তাকে পাগল ঠাওরাইল। তিনি জুরিচ বিশ্ববিদ্যালয়ের পি. এইচ. ডি. উপাধি লাভের জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট উক্ত প্রবন্ধ প্রেরণ করেন। সনাতন মত-পন্থী প্রফেসর ক্লাইনার প্রবন্ধটি উপাধি প্রাপ্তির যোগ্য মনে করিলেন না। তিনি আইনস্টাইনকে বলিলেন, 'দেখ ছোকরা, তুমি এত বাজে বক কেন? ইথার নাই, সময় স্থির নয়, তাহা পারমাণবিকতার বিশেষ অবস্থার উপর নির্ভর করে, এসব কি কথা? কিন্তু শুনিয়াছি যে গণিতে তোমার মাথা খুব পরিষ্কার, লাগিয়া থাকিলে তোমার দ্বারা উন্নতি অসম্ভব নহে। তুমি এক কাজ কর—এমন কোন গবেষণাপত্র লিখ, যাহা পদার্থবিদ্যার বৈজ্ঞানিকদের নিকট গ্রহণীয় হইতে পারে।'

এইরূপে রিলেটিভিটি প্রবন্ধ অগ্রাহ্য হইল এবং তাহার স্থানে যেমন-তেমন বিষয়ে একটি মৌলিক প্রবন্ধ লিখিয়া আইনস্টাইন উপাধি লাভ করিলেন, কিন্তু সকল বৈজ্ঞানিকই ক্লাইনারের মতো আপেক্ষিক তত্ত্বকে উড়াইয়া দিলেন না। কোয়াণ্টাম থিওরির প্রবর্তক, বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত প্রফেসর ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক

আইনস্টাইনের কাছে একখানা অশেষ প্রশংসাপূর্ণ পত্র লিখলেন। ফরাসী দেশীয় বিখ্যাত পণ্ডিত পঁয়কারের নিকট হইতেও ঐরূপ একখানা পত্র আসিল। য়ুরোপের দুইটি শ্রেষ্ঠ পদার্থবিদের দুইটি প্রশংসাপত্র বৈজ্ঞানিক জগতের নিকট আইনস্টাইনের যশ ও প্রতিষ্ঠার পথ চিরদিনের জন্য উন্মুক্ত করিয়া দিল।

... ...

আইনস্টাইনের প্রতিভা কেবল থিওরি অব রিলেটিভিটি আবিষ্কার করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, প্ল্যাঙ্কের কোয়াণ্টাম তত্ত্ব আইন-পুনর্জীবিত করেন। পদার্থবিজ্ঞানের অনেক অন্ধকারময় প্রদেশ তাঁহার প্রতিভার রশ্মিজালে উদ্ভাসিত হইয়াছে। ১৯০০ খ্রীস্টাব্দের পূর্বে বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করতেন যে, আলোকের তেজ (energy) তরঙ্গের মতো আকাশে ছড়াইয়া পড়ে। ১৯০০ খ্রীস্টাব্দে প্লাঙ্ক বলিলেন যে, আলোকের তেজ ছড়াইয়া পড়ে না, উহা পারমাণবিক মাথায় কোষবদ্ধ হইয়া আকাশে ধাবিত হয়। ইহাকেই কোয়াণ্টাম তত্ত্ব বলে।

এই তত্ত্ব প্রথম প্রথম বিজ্ঞানীরা গ্রহণ করিতে চাহেন নাই। কিন্তু আইনস্টাইন দেখাইলেন যে, এই তত্ত্ব গ্রহণ করা ছাড়া গত্যন্তর নাই। তিনি প্ল্যাঙ্কের উপপত্তিকে পুনর্জীবিত করেন। বহুদিন হইতে জানা ছিল যে ধাতুর পাত্রের উপর আলোক পড়িলে উক্ত ধাতু হইতে তড়িৎকণা (electrons) বাহির হয়। পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল যে, আলোক তরঙ্গ যত ছোট হয় তড়িৎকণা তত বেগে ধাতুর পাত হইতে বেগে ফুটিয়া বাহির হয়। আইনস্টাইন দেখাইলেন যে, যদি ধরা যায় যে আলোকের তেজ অবিশ্রান্ত ছড়াইয়া পড়ে তাহা হইলে এই ব্যাপারের ব্যাখ্যা হয় না। ধরিতে হইবে যে আলোক নির্দিষ্ট পরিমাণে কোষবদ্ধ হইয়া বিস্তৃত হয়। বায়ুমণ্ডলের মধ্যে যে সমস্ত ক্ষুদ্রকণা নিরন্তর চঞ্চল নৃত্যে ভাসিয়া বেড়াইতেছে তাহাদের গতিভঙ্গী (Brownian movement)

সম্বন্ধে তিনি যে সমস্ত তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন, বিজ্ঞান জগতে তাহাতে নূতন চিন্তা ও গবেষণার পথ বাহির হইয়াছে। প্রাচীনদের বিশ্বাস ছিল কোন জিনিসের ওজন কখনো পরিবর্তন হইতে পারে না। আইনস্টাইন প্রমাণ করিলেন যে, জিনিসের ওজন ঠিক থাকে না। কোন জিনিসের তড়িৎরেণু যদি খুব বেগে ধাবিত হয় তবে তাহার ওজন খুব বাড়িয়া যায়। অবশ্য এ ব্যাপারে কতিপয় বৎসর পূর্বে কাউফম্যান পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করিয়াছিলেন। কিন্তু আইনস্টাইন ইহার প্রকৃত নিয়ম তাঁহার আপেক্ষিক তত্ত্ব হইতে প্রমাণ করেন।

আইনস্টাইনের জীবনের যে সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি-রিলেটিভিটির সাধারণ বা অবিশেষ সত্য (generalised theory), সে সম্পর্কে কোনও কথা বলিতে গেলে দেখা যায় যে, লৌকিক ভাষায় তাহা ব্যক্ত করা সহজসাধ্য নহে। তিনি পদার্থ বিজ্ঞানের প্রাচীন গৃহটিকে ভাঙিয়া চুরিয়া তাহার উপর নূতন সৌধ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

পরিশিষ্ট (ঘ)

আইনস্টাইনের জীবনের ঘটনাপঞ্জী

১৮৭৯, ১৪ই মার্চ	—জন্ম ব্যাভেরিয়ার (জার্মানি) উলম্‌নগরে।
১৮৮১	—আইনস্টাইন পরিবার মিউনিকে চলে আসেন।
১৮৮১-১৮৯৪	—মিউনিকের স্কুলে লেখাপড়া করেন।
১৮৯৪	—আইনস্টাইন পরিবার ইতালির মিলানে চলে আসেন।
১৮৯৬-১৯০১	—সুইজারল্যাণ্ডে জুরিচ্ পলিটেকনিক্যাল স্কুলে অধ্যয়ন।
১৯০১	—সুইস নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন।
১৯০২	—বার্নের পেটেণ্ট অফিসে চাকরি গ্রহণ। প্রথম বিবাহ।
১৯০৫	—কোয়াণ্টাম তত্ত্ব, অপেক্ষবাদ, ও ব্রাউনিয়ান মোশান সম্পর্কে গবেষণা নিবন্ধাবলী প্রকাশ। বার্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে লেকচারার নিযুক্ত।
১৯০৯	—জুরিচ্ বিশ্ববিদ্যালয়ে তত্ত্বীয় পদার্থবিজ্ঞানের এ্যাসোসিয়েট অধ্যাপক।
১৯১০	—প্রাগে জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়ে তত্ত্বীয় পদার্থ-বিজ্ঞানের অধ্যাপক।
১৯১২	—জুরিচ পলিটেকনিকে তত্ত্বীয় পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক।
১৯১৩	—প্রুশিয়ান অকাদেমির সদস্য ; বার্লিনে অবস্থান।

১৯১৬ —জেনারেল রিলেটিভিটি সম্পর্কে গবেষণা সম্পূর্ণ। দ্বিতীয়বার বিবাহ।

১৯১৯ —মহাকর্ষ ক্ষেত্রে জেনারেল রিলেটিভিটি থিওরি চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত।

১৯২১ —মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য দেশে সফর। Photo electric Effect-এর জন্য নোবেল পুরস্কার লাভ।

১৯২৯ —একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্ব (Unified Field Theory) প্রকাশ।

১৯৩৩ —প্রুশিয়ান অকাদেমির সদস্যপদে ইস্তফা; নিউজার্সিতে প্রিন্সটনে ইনস্টিট্যুট ফর য়্যাডভানসড্ স্টাডিতে অধ্যাপক হিসাবে যোগদান।

১৯৪০ —মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব গ্রহণ।

১৯৪৫ —প্রিন্সটনের কর্ম থেকে অবসর গ্রহণ।

১৯৫৫, ১৮ এপ্রিল —প্রিন্সটন হাসপাতালে মৃত্যু।

'MY BRAIN IS MY LABORATORY'

His Brain is still being studied—EINSTEIN

Princeton (New Jersey), July 28—A pathologist says he has been studying Albert Einstein's brain since the physicist died 23 years ago and is keeping a portion of it in a stone jar in a Wichita (Kansas) laboratory reports AP.

Dr. Thomas S. Harvey, who performed the autopsy on Einstein in 1955, is however, reluctant to discuss details of the study he claims is being done for the Einstein estate.

The disclosure that portions of the brain were floating in a large stone jar in Dr. Harvey's Wichita laboratory was made in the August issue of New Jersy Monthly Magazine, a Princeton-based publication. The magazine sent its senior editor, Mr. Staven Levy in quest of Einstein's brain.

When Einstein died at Princeton Hospitals several hospitals clambered to study the brain of the man who formulated the theory of relativity. The brain was sought by Monteflore Hospital in New York but Princeton Hospital won the right in an autopsy authorization. Dr. Harvey was placed in charge of the study.

"There have been off and on different people studying the brain." Dr. Harvey said. "Quite a group has worked on it. They're from across the country." The pathologist said there were no target dates for the completion of the study.

Einstein, who used to say, "my brain is my laboratory", requested that his brain be removed for posthumous study. After his death at the age of 76, his brain was sectioned in a laboratory at the University of Pennsylvania.

Mr. Levy, who saw the jar, described its contents in an article thus : "Floating inside the jar in a clear liquid solution, were several pieces of matter... A fist-sized chunk of grayish, lined substance, the apparent consistency of sponge. And in a separate pouch, a mass of pinkish-white string resembling bloated dental floss."

পরিশিষ্ট (ঙ)

আইনস্টাইনের রচনা ও বাণী

[এক] এই মহাবিশ্বে প্রাণ-অপ্রাণ সকলের নিয়ন্ত্রণে একই নীতি নানাভাবে স্বপ্রকাশ। বিশ্বজগতে একাধিক শক্তির নিয়ন্ত্রণে আমি বিশ্বাস করি না। মহাকর্ষ ও তড়িৎ-চৌম্বক শক্তির সংযোগহীন পারম্পর্য আমার চিন্তা ও উপলব্ধির কাছে অসহনীয়। প্রকৃত ও আপাত সত্যের মধ্যে এ এক অদ্ভুত সংগতিহীন, আরোপিত ব্যবধান, বক্তব্যহীন শূন্যতার বিনিময়ে পাওয়া। এই শক্তি মহাজাগতিক নিয়ন্ত্রণের দিকে দিগন্তরে নানা ব্যঞ্জনায় নিত্য প্রকাশিত।

[দুই] বিশ্বচরাচরে প্রাণ-অপ্রাণ সকলের কাছে যিনি স্বপ্রকাশ আমি সেই ঈশ্বরকে মানি। আমি বিশ্বাস করি, ঈশ্বর কখনো জুয়া খেলেন না ('God does not play at dice')। আমি বেশ অনুভব করতে পারি, এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টির মূলে আছে অজ্ঞেয় অলৌকিক ও চিরভাস্বর প্রতিভার প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ। এ পার্থিব জীবনের শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্যবোধ ও মহত্তর অনুভূতিগুলিও সেই অতীন্দ্রিয় জগতের স্পর্শ পায় না। জাগতিক স্থূল বুদ্ধিবৃত্তি, তীব্র বাস্তবতা-নিয়ন্ত্রিত ও দৈহিক সীমানায় আবদ্ধ আমাদের ইন্দ্রিয়জাত অনুভূতি ও জ্ঞান সেই সুদূরপ্রসারী কল্পনা, সূক্ষ্ম দূরদৃষ্টি ও উপলব্ধিকে আচ্ছন্ন করে রাখে। মহাজাগতিক সেই অপার অস্তিত্বকে স্বীকার করতে বিজ্ঞানীরা সংকোচ বোধ করেন—পাছে লোকে ভাবে এ তাঁর মোহ। অথচ এই অজ্ঞেয় সত্যের সন্ধানেই তো শত সহস্র রহস্যের আবরণ উন্মোচন করে প্রকৃত বিজ্ঞানের পথ রচনা করতে পারে।

[তিন] এক মহাজাগতিক অতীন্দ্রিয় চেতনা আমাকে বিজ্ঞান সাধনা ও সত্যানুসন্ধানে নিত্য প্রবর্তনা জুগিয়েছে। অসীম রূপ-রহস্যে ভরা দুর্জ্ঞেয় শক্তির আধারস্বরূপ যে বিশ্বনিয়ন্তার সুনিয়ন্ত্রিত নিয়মশৃঙ্খলা বিশ্বচরাচরে নিত্য পরিব্যাপ্ত আমি সে রহস্যের অনুভূতি লাভ করেছি অসীম কৃতজ্ঞতা ও বিস্ময়কর তৃপ্তিবোধ নিয়ে।

এই অমূর্তের অনুসন্ধানই রচনা করেছে আমার ধর্মবোধ, আমার ঈশ্বর। এক সুললিত সংগীতের সুসমঞ্জস ছন্দের মতোই এই মহাবিশ্ব এক সুনিয়ন্ত্রিত শৃঙ্খলায় সদাছন্দিত। বার্কলে, দেকার্তে, স্পিনোজা মহাপ্রকৃতির কর্মমুখর এই ছন্দের নাম ঈশ্বর। [চার] জীবনকে যথাসম্ভব আড়ম্বরহীন রাখতে পারলেই মানুষ সুখী হয়। [পাঁচ] যেমন শক্তির ওপর আমাদের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই, তাই দিয়ে শুরু এবং শেষ সব কিছু নির্ধারিত হয়ে থাকে। কীট পতঙ্গের পক্ষে যেমন, নক্ষত্রদের সম্পর্কেও এটি পরম সত্য। [ছয়] নিয়ম দ্বারা নয় কল্পনার দ্বারাই শ্রেষ্ঠ কর্ম সম্পন্ন হয়ে থাকে। কল্পনা বলতে আমি বুঝি বোধি (intuition) এবং জ্ঞান অপেক্ষা কল্পনার গুরুত্ব অধিক। [সাত] বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা ব্যতিরেকে বিজ্ঞানের কোন অস্তিত্ব নেই। [আট] রহস্যের অভিজ্ঞতাই সবচেয়ে সুন্দর। যাবতীয় প্রকৃত শিল্প ও বিজ্ঞানের উৎস হলো এই। [নয়] সমাজের প্রতি আত্মনিয়োগ করেই মানুষ জীবনের তাৎপর্য খুঁজে পায়। [দশ] পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর মানুষ হলেন প্রখ্যাত বাঙালী কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সমুন্নত দেহ, উন্নত মনের অধিকারী এই ভারতীয় দার্শনিকের তুল্য শ্রেষ্ঠ প্রতিভা আমি দেখতে পাই না। তাঁকে দেখে আমার মনে হয়েছিল তিনি যেন একাধারে কবি ও ঋষি। নিঃসন্দেহে সর্বকালের সর্বদেশের মানুষের মনের অধীশ্বর তিনি। [এগার] আপেক্ষিক তত্ত্বের অর্থটা লোকে ভীষণ ভাবে ভুল বুঝেছে। এর অর্থ এই নয় যে, জীবনের সবকিছু আপেক্ষিক আর এই পৃথিবীকে খুশিমত ওপর নিচ করে দেবার অধিকার আমাদের আছে। [বারো] অর্জিত জ্ঞানের থেকে সত্যের সন্ধান অধিকতর মূল্যবান। [তেরো] যদি এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে বুঝতে হয় তাহলে সকলের আগে আমাদের মুক্ত হতে হবে পঞ্চেন্দ্রিয়ের সংস্কার থেকে। [চৌদ্দ] যে নিয়মে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড চলে সুরের জগৎ ঠিক সেই নিয়মেই চলে। মানুষের জীবনে সংগীত একটা

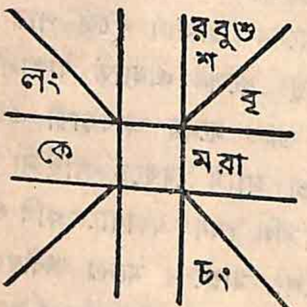
শ্রেষ্ঠ সম্পদ। [পনর] জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে পৃথিবীর সকলের মানুষের জীবন সুখ ও শান্তিতে ভরে উঠবে, আজীবন আমি সবার মধ্যে এই আশা পোষণ করে এসেছি। [ষোলো] মানুষের মূল্য তার অন্তরের সম্পদের জন্য, বাহ্যিক আড়ম্বরের জন্য নয়। [সতের] গবেষণার মধ্যে মন-প্রাণ ঢেলে দেওয়াই গবেষণার প্রধান কাজ।

পরিশিষ্ট (চ)

আইনস্টাইনের রাশিচক্র বিচার

—অধ্যাপক ডক্টর রামজীবন আচার্য

আলবার্ট আইনস্টাইন বিশ্বের বৈজ্ঞানিকজ্যোতিষ্কদের অন্যতম উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। তাঁর জন্মসময়ের গ্রহসংস্থান রাশিচক্রে যে আকার ধারণ করেছে তা এরূপ:



আলবার্ট আইনস্টাইনের জন্ম শতবর্ষে তাঁর এই রাশিচক্র-বিচারের মধ্যে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধানিবেদন প্রয়াস। সেই সঙ্গে সেই বিরাট বৈজ্ঞানিকের জীবনের সঙ্গে গ্রহসংযোগ অবগতির প্রযত্ন।

প্রতি জাতকের প্রথম বিচার্য লগ্ন। এই লগ্ন থেকে দেহ, প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি জীবনের অতি মূল্যবান বিষয়গুলি বিচার হয়ে থাকে। আইনস্টাইন ছিলেন মিথুন লগ্নের জাতক। সাধারণতঃ লগ্নাধিপতি বুধ বিবুধ গ্রহ বলে মিথুনের জাতক হন বিদ্বান। তাঁর লগ্নাধিপতি বুধ মীনে নীচ অবস্থায় থাকলেও সর্বশাস্ত্র কোবিদ তুঙ্গী শুক্রের সহাবস্থানে নীচভঙ্গরাজ যোগকারক। ধুব কেবল শুক্রের যোগে বলবান তাই নয়, তিনি আদিত্য সঙ্গে আনন্দিত। আরো উল্লেখ্য লগ্ন বৃহস্পতি কর্তৃক দৃষ্ট। লগ্নসংক্রান্ত গ্রহযোগের বিচার আইনস্টাইনের অতি শুভ প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি বহন করে।

সাধারণতঃ চতুর্থস্থান থেকে বিদ্যা ও পঞ্চম স্থান থেকে প্রতিভার বিচার করতে হয়। আইনস্টাইনের চতুর্থপতি বুধ ও পঞ্চমপতি শুক্রের অবস্থান লক্ষ্য করার মতো। পূর্বেই বলা হয়েছে বুধ নীচ-ভঙ্গ রাজযোগের কারক। তিনি সকলশাস্ত্রে সুপণ্ডিত মীনস্থ তুঙ্গী শুক্রের সঙ্গে, তুঙ্গাভিলাষী রবির যোগে বলধর। গণিতাদিবিদ্যার কারক বুধ আইনস্টাইনের জীবনে যথেষ্ট কারকতা দেখাতে পেরেছেন। শুক্র সর্বশাস্ত্রজ্ঞ হলেও ললিত কলাদিতে তাঁর কারকতা সবিশেষ। বুধ শনি যোগ আইনস্টাইনকে যেমন বিজ্ঞানচর্চায়, তেমনি বুধ শুক্রযোগ গীত-বাদ্যচর্চায় উদ্বুদ্ধ করেছে। এখানে আরো উল্লেখ করতে হয়, বুধ-শুক্র-শনির সঙ্গে আপন ভবনে-চতুর্থ সপ্তমদৃষ্টি দিয়েছেন, বৃহস্পতি পঞ্চমে-প্রতিভাস্থানে দিয়েছেন নবম দৃষ্টি। পরম প্রজ্ঞাবান বৃহস্পতির এই দৃষ্টি তাঁকে করেছিল প্রজ্ঞাধর। বিশ্বের রহস্যানুসন্ধানে তাঁর চিন্তা বারংবার উধাও হয়ে গেছে। দ্বিতীয় স্থান থেকেও বিদ্যার সূচনা লক্ষিত হয়। গণিতজ্ঞ, আত্মানুসন্ধানী, অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন কেতু সৌম্যভবনস্থ হ'য়ে জাতককে গণিতে করেছে অনুরক্ত। জৈমিনী সূত্রের প্রথম অধ্যায়ে ১১৪ সূত্রে "কেভুনা গণিতজ্ঞঃ"-এরূপ বলা হ'য়েছে। এখানে আরো বলা প্রয়োজন, চন্দ্রের পঞ্চমে বুধ রবি-শুক্রের অবস্থান জাতককে বিশ্ব-বরেণ্য বৈজ্ঞানিকের সম্মান দিয়েছে।

নবম থেকে বিচার্য ভাগ্য ও দশম থেকে কর্ম। দ্বাদশ গৃহের মধ্যে ভাগ্যগৃহের গুরুত্ব বলা হয়েছে দুটি কারিকায়ঃ

ভাগ্যস্থানং পরং জ্ঞেয়ং বিহায় ভবনান্তরম্।
আয়ুর্বিদ্যাযশো বিত্তং সর্বভাগ্যে প্রতিষ্ঠিতম্॥
বিহায় সর্বং গণকৈ র্বিচিন্ত্যং ভাগ্যালয়ং কেবলমত্রযত্নাৎ
আয়শ্চ মাতা চ পিতা চ বংশো ভাগ্যান্বিতৈনৈব ভবন্তি ধন্যাঃ॥

আয়ু, বিদ্যা, যশ, বিত্ত সবই; মাতা, পিতা বংশ সকলই ভাগ্যবশে কর্মস্থান সম্পর্কে বলা হয়েছে—

কর্মণ্যেব প্রধানে চ গ্রহাঃ সর্বেঃ ফলপ্রদাঃ
তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন কর্মস্থানং বিচিন্তয়েৎ ॥

রাশিচক্রে বহুবিধ ফল নির্দেশের স্থান থাকলেও নর-নারী কর্মফল ভোগ করে। তাই কর্মস্থানের গ্রহযোগ বিচারণীয়।

আইনস্টাইনের ভাগ্য ও কর্মের যোগ অপূর্ব। ভাগ্যপতি শনি দশমে ও কর্মপতি বৃহস্পতি নবমে থেকে বহু সম্মান যোগের কারক হয়েছেন।

ভগ্যরাজ্যেশ্বরৌ ভাগ্যে রাজ্যেবান্যোন্যারাশিগৌ।
জাতৌ স্বস্বগৃহে যাতৌ যোগোহয়ং প্রবলঃ স্মৃতঃ ॥

তবে উল্লেখ করতে হয় মিথুন লগ্নের শনি অষ্টমপতি ও নবমপতি বিধায় প্রথমে জীবনে আনেন বাধা, পরে আনেন সমুন্নতি। আবার এই জাতকের অষ্টমস্থ রাহু ও তাঁর ভাগ্যস্থানে দ্বাদশ দৃষ্টি বাধাকে করেছে নিশ্চিত। তবে ভাগ্যেশ্বরের রাজ্যাধিষ্ঠান, রাজ্যেশ্বরের ভাগ্যাধিষ্ঠান, রবির বুধযোগে তুঙ্গাভিলাষ, শুক্রের তুঙ্গত্ব, কেন্দ্র কোণপতি বুধ শুক্রের সহাবস্থান কোন কোণপতি শুক্র-শনির একত্রাবস্থিতি ইত্যাদি জাতককে যুগজয়ী যশোরাশির রাজ্যে করেছে প্রতিষ্ঠিত।

জাতক চন্দ্রপ্রভাযোগ ও ক্ষেত্র-সিংহাসন যোগের সুফলপ্রাপ্তির অধিকারী হয়েছেন।

এলবার্ট আইনস্টাইনের সপ্তমে দৃষ্টি ও সপ্তমপতি বৃহস্পতিতে রাহুর দৃষ্টি পত্নী সুখের হানি কারক; অষ্টমে মঙ্গল ও রাহুর সহাবস্থানও মঙ্গলপ্রদ নয়। যদিও মঙ্গল মকরে উচ্চ। তবে রাহু-মঙ্গলের অষ্টম ভবনাধিষ্ঠান দীর্ঘ আয়ুর বিধানের যোগ দিলেও সংসার স্ত্রী-শান্তি ইত্যাদি সুখভোগের বিঘ্ন বিধান করে। এই প্রসঙ্গে বৃশ্চিকের পাপ দৃষ্টি বর্জিত চন্দ্র ও শুক্রের তুঙ্গস্থানগ্রহণ জাতকের পূর্ববর্ণিত সুখহানিকে লঘু করে দিয়েছে, সুখ-সঞ্চারের প্রয়াস পেয়েছে।

(আধুনিক জ্যোতিষ নববর্ষ সংখ্যা ১৩৮৫)

শিশুবর্ষে গৃহীত পরিকল্পনার

৪৬

গ্রন্থ